মিস্টার ৪২০

সুমন্ত আসলাম

Mr. 420

মিস্টার ৪২০

সুমন্ত আসলাম

Mr. 420

মিস্টার ৪২০
সুমন্ত আসলাম
© লেখক

৬ষ্ঠ+৭ম মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮
পঞ্চম মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮
চতুর্থ মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮
প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮

সময়

সময় ৬১২

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচি হাজরা

কম্পিউটার কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য: ১২৫.০০ টাকা মাত্র

MR. 420 a novel by Sumanto Aslam. First Published: February 2008, by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.
Web: www.somoy.com E-mail: f.ahmed@somoy.com
sumanto_aslam@yahoo.com

Price: Tk. 125.00 only

ISBN 984-70114-0012-9 Code: 612

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : **'সময় . . .'** প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা),
সড়ক ১৪ (নতুন), ধানমন্ডি (মিরপুর রোড), ঢাকা

গল্পটা ছিল মাত্র তিনশ চার শব্দের। পড়ে বেশ ভালো লাগল। স্রষ্টা অসাধারণ একটা গুণ দিয়েছেন আমাকে—কারো কিছু ভালো লাগলে সেটার প্রশংসা করা। গল্পের লেখকটাকে সরাসরি প্রশংসা করার জন্য আমি কয়েকবার খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। অবশ্য খোঁজার আরেকটা কারণও ছিল। আমি একটা উপন্যাস লিখব তাঁর এই গল্পের মজার অংশটুকু নিয়ে, সেই অনুমতিটা নিয়ে নেওয়া। যেহেতু তাঁকে পাই না, তাই অনুমতিও নেওয়া হয় না তাঁর। কিন্তু যখনই কোনো কিছু লিখতে যাই তখনই মাথার ভেতর কুটকুট করে কামড়াতে থাকে ঘটনাটা। ভয়াবহ যন্ত্রণার ব্যাপার!

লিখতে লিখতে একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি—না, অন্য কোনো লেখা লিখব না এখন, ওই মজার অংশটুকুর সঙ্গে আরো অনেকগুলো মজার ঘটনা নিয়ে উপন্যাস শেষ করব আগে। যা ভাবা, তাই কাজ।

প্রিয় আহমেদ মামুন

আপনাকে আমি চিনি না, কখনো দেখা হবে কিনা তাও জানি না। দেখা হোক অথবা না হোক, এ উপন্যাসটা পড়ে দেখবেন, প্লিজ। পড়া শেষে আপনি ভীষণ চমকে উঠে বলবেন, আরে, আমার গল্পের চেয়েও তো মজার হয়েছে এ উপন্যাসটা!

হা-হা-হা।

মজার একটা উপন্যাস লিখব বলে অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম, স্রেফ মজার। কোনো উপদেশ থাকবে না তাতে, থাকবে না কোনো কঠিন কঠিন কথা, এমন কি কোনো নীতি বাক্য। কিন্তু গল্প থাকবে সেখানে–আনন্দ, উচ্ছলতা আর দুরন্তপনার গল্প। সেটা হবে একটা নির্ভেজাল মজার উপন্যাস।

মজার উপন্যাস তো বললাম, কিন্তু সেটা কি আদৌ কোনো মজার উপন্যাস হয়েছে? কে বলবে সেই কথা? অনেক ভেবে দেখলাম–সে কথাটা আপনাকেই বলতে প্রিয় পাঠক, রায় দিতে হবে আপনাকেই।

সুমন্ত আসলাম
sumanto_aslam@yahoo.com

খায়রুল ভাইকে এখন আমি আঙ্কেল ডাকি। আজ সকাল থেকেই তাকে এই আঙ্কেল ডাকা। অথচ প্রথম দিন থেকে শুরু করে গত রাত পর্যন্ত তাকে ভাই বলে ডেকেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে অন্য কোনো সম্বোধনে ডাকিনি তাকে। ভাই ডেকেছি, স্রেফ ভাই, খায়রুল ভাই। খায়রুল ভাইয়ের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হলেও তিনিও আমাকে ডাকতেন ভাই—অর্ণক ভাই। বেশির ভাগ সময় বলতেন ছোট ভাই।

খায়রুল ভাই আমাদের বিল্ডিংয়ের নতুন ভাড়াটে। পাড়ার চার রাস্তার মোড়ে আমরা যে সাড়ে ছয়তলা বিল্ডিংটাতে ভাড়া থাকি, মাস দেড়েক আগে সে বিল্ডিংয়ের তিনতলায় এসে উঠেছেন তিনি। সঙ্গে একটা বউ, একটা পনেরো বছরের ছেলে আর একটা নয় বছরের মেয়ে।

সাড়ে ছয়তলা বিল্ডিংয়ের তেরো ইউনিটের বারো ইউনিটই কাপল ভাড়াটে, আমরাই কেবল ব্যাচেলর ভাড়াটে। ব্যাচেলর হিসেবে আমাদের স্থানও হয়েছে ছাদের অর্ধেক জুড়ে যে ইউনিট আছে সেখানে। ভার্সিটিতে প্রতিদিন ক্লাস করার পর দু-দুটো টিউশনি শেষে যখন এই ছয়তলার সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠি, গলার ভেতর থেকে তখন প্রায় পুরো জিভটা বেরিয়ে আসে লম্বা হয়ে। অথচ আকাশ বেয়ে ওঠা এ জায়গাটা ভাড়া পেতেই আমাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আমাদের বাড়িওয়ালাটা একজন খচ্চর ধরনের লোক, আমরা আড়ালে-আবডালে বলি বদ লোক। কিছলু ভাই, রবি, পল্লব আর আমি যেদিন টু-লেট দেখে এ বাসাটা ভাড়া নিতে আসি, সেদিন দরজায় নক করার প্রায় পনেরো মিনিট পর বুকের কাছে লুঙ্গি গিঁটু দেওয়া খালি গায়ের এক মোটকা ধরনের লোক বের হয়ে আসেন বাসা থেকে। তারপর আমাদের দিকে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, 'দরজায় নক করেছে কে?'

পল্লব কিছুটা ভয় ভয় গলায় বলল, 'আমি।'

'ক্যান?'

কিছলু ভাই কী একটা বলতে নিয়ে কেমন যেন থেমে গেলেন, বলতে পারলেন না। কিছলু ভাইয়ের একটা অভ্যাস হলো, কোনো কিছু বলার আগে মনে করে নেন তিনি কী বলবেন। কিন্তু সবচেয়ে ট্র্যাজেডি হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথা বলার আগে তিনি যা মনে করেন, কথা বলতে নিয়েই তিনি তা ভুলে যান। সেদিনও ভুলে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি লুঙ্গি পরা মোটকা লোকটাকে বললাম, 'আঙ্কেল, আমরা মোটেই দরজায় নক করতে চাইনি...।'

'কিন্তু করেছেন তো—।' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মোটকা লোকটা বললেন, 'ক্যান? দেখছেন না অনেক দামি কাঠ দিয়ে দরজা বানানো হয়েছে, টোকাটুকি করলে কাঠ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

দরজার দিকে তাকালাম আমরা। সত্যি অনেক দামি কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে, চকচক করছে দরজাটা। আমি দরজাটা আলতো ছুঁয়ে বললাম, 'এত দামি কাঠ দিয়ে দরজা বানিয়েছেন, কিন্তু এত বড় বাড়িতে একটা কলবেল লাগাতে পারেননি!'

'পারেননি মানে কী?'

কিছলু ভাই আমার হাত টেনে ধরে মোটকা লোকটাকে বললেন, 'স্যরি চাচা, দরজায় টোকা দেওয়াটা আসলেই ঠিক হয়নি। আমি সবার পক্ষ থেকে আবারও স্যরি বলছি।'

'তা কী চাই?'

'বাইরে টু-লেট ঝোলানো দেখলাম।'

'তো?'

'আমরা বাড়িওয়ালার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছি।'

'বলুন।'

'আপনি বাড়িওয়ালা?'

'কেন, আমাকে দেখে কি বাড়িওয়ালা মনে হচ্ছে না?'

'না না, তা মনে হবে না কেন!' গদগদ হয়ে কিছলু ভাই প্রায় গলে গেলেন, 'স্যরি, আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমরা মনে করেছিলাম...।' কিছলু ভাই আবার ভুলে যান। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, 'সত্যি বলতে কি আমরা মনে করেছিলাম বাবুর্চি।'

'কী!' মোটকা লোকটা চিৎকার করে ওঠে।

'স্যরি স্যরি, ও ভুল বলেছে। আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল আপনিই বাড়িওয়ালা।' কিছলু ভাই আমার একটা হাত ধরে পেছনে ঠেলে দেন ঝটকা মেরে।

'কথা শেষ করুন।' বাড়িওয়ালা রাগী গলায় বলেন।

'আমরা কি আপনার বাড়িটা ভাড়া পেতে পারি?' মোসাহেবির চরম পর্যায়ে চলে গেলেন কিছলু ভাই। কথা শেষ করেই তিনি হাত কচলাতে লাগলেন। আমার এত রাগ হলো যে ইচ্ছে করছিল বত্রিশ দাঁত একসঙ্গে বসিয়ে দিয়ে কিছলু ভাইয়ের হাতে জোরসে একটা কামড় মারি।

মোটকা লোকটা আমাদের দিকে প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য নিয়ে তাকালেন। তারপর আরো তাচ্ছিল্য নিয়ে বললেন, 'আপনাদের কি বউ-বাচ্চা আছে, আই মিন আপনারা কি বিবাহিত?'

'জি না।' আগের মতোই হাত কচলাতে লাগলেন কিছলু ভাই।

'স্যরি, আপনারা যেতে পারেন।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'ব্যাচেলরদের কাছে আমি বাড়ি ভাড়া দিই না।'

'কেন?'

'সব কেনর উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

'সেটা আমরা জানি। কিন্তু কারণটা তো বলবেন, কেন আপনি ব্যাচেলরদের কাছে বাড়ি ভাড়া দেন না?'

'ব্যাচেলররা ভালো হয় না।'

'কী ধরনের ভালো হয় না?' রাগে আমরা মাথার চাঁদি ফেটে যেতে চাইছে।

'তাদের চরিত্র খারাপ হয়।'

'তাই নাকি! তো আপনিও তো একসময় ব্যাচেলর ছিলেন, আপনার চরিত্রও কি...?' কথাটা শেষ করলাম না আমি। লোকটাও কিছু বললেন না, ঠাস করে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

কিছলু ভাই আমার হাত টানতে লাগলেন, কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তবু। তার হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজায় টোকা দিলাম আবার। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবাক করে দিয়ে একটা মেয়ে খুলে দিল দরজাটা। পিচঢালা রাস্তার সঙ্গে প্রচণ্ড ব্রেক কষা টায়ারের শব্দের মতো কর্কশ গলায় সে বলল,

'কাকে চাই?'

'বাড়িওয়ালাকে।'

'বাবা বাথরুমে, যা বলার আমাকে বলুন।'

আমার বলার আগেই কিছলু ভাই বেশ লাজুক লাজুক গলায় বললেন, 'আসলে...বাসাটা আমাদের খুবই প্রয়োজন।'

'কিন্তু বাবা তো আপনাদের বলে দিয়েছে কোনো ব্যাচেলরকে তিনি বাসা ভাড়া দেবেন না।'

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনার বাবার মতো আপনারও কি ধারণা ব্যাচেলররা খারাপ চরিত্রের হয়?'

'জি।'

'আপনার জবাব শুনে বেশ ভালো লাগল।' মেয়েটার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, 'আপনার জন্য একটা পরামর্শ আছে আমার।'

'কিসের পরামর্শ?'

'ব্যাচেলররা যেহেতু খারাপ চরিত্রের হয়, তাই একজন বিবাহিত লোককে বিয়ে করবেন প্লিজ, কয়েক বাচ্চার বাপ হলে ভালো হয়, তবে ভুলেও কোনো ব্যাচেলরকে বিয়ে করবেন না, কক্ষনোই না।'

মেয়েটি রেগে আগুন হয়ে গেছে, কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা বের হওয়ার আগেই কিছলু ভাইয়ের হাত ধরে টান দিলাম আমি, ইশারা করলাম রবি আর পল্লবকেও। দু পা আসার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ঠাস করে একটা শব্দ হলো, আমরা টের পেলাম দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে আবার।

মাস দুয়েক পর এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি টু-লেটটা তখনো ঝোলানো। বাসায় এসে কিছলু ভাইকে কথাটা বলতেই শার্ট-প্যান্ট পরা শুরু করলেন তিনি। আমি বললাম, 'কোথায় যান?'

'দেখি আবার একটু চেষ্টা করে, বাসাটা ভাড়া নিতে পারি কি না। এ বাসায় তো থাকা যাচ্ছে না, মনও টিকছে না।'

'এখনই যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার তো এখন যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'তোমাকে নিচ্ছিও না; আমি, রবি আর পল্লব যাব।'

আমি হেসে হেসে বললাম, 'কেন?'

কিছলু ভাই আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'তোমাকে দেখার

সঙ্গে সঙ্গে বাপ-মেয়ে দুজনই খামচে ধরবে, এমনকি ছুরি দিয়ে কোপাতেও আসতে পারে। এবার বলো, তোমার কি ছুরির কোপ খাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

'না।'

'তাহলে তুমি বাসায় থাকো, আমরা একটু ঘুরে আসি।'

তিন ঘণ্টা পর কিছলু ভাই হাসতে হাসতে বাসায় ফিরে এলেন। আমাদের ঘরের একমাত্র চেয়ারটাতে পা তুলে বসে বেশ ভাব নিয়ে বললেন, 'তোমরা তো পোলাপান মানুষ, একটুতেই মাথা গরম করে ফেল। কোনো জায়গায় কিছু বলতে হলে মাথা ঠান্ডা করে বলতে হয়। তাহলেই ভালো একটা রেজাল্ট আসে। বুঝেছ?'

'আপনি বাসাটা পেয়ে গেছেন?' পেপার পড়া বাদ দিয়ে সেটা বিছানার পাশে রেখে কিছলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললাম আমি।

'তোমার কী মনে হয়?' কিছলু ভাইয়ের মুখে বিজয়ীর হাসি।

'আমার তো মনে হয় পেয়েছেন, তবে এর জন্য আপনি কেবল মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলেননি, আরো কিছু করেছেন?'

চেয়ার থেকে পা নামালেন কিছলু ভাই। আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'আরো কিছু মানে?'

'আরো কিছু মানে—।' কথাটা শেষ করলাম না আমি। চারজনের বাড়ি চার জেলায় হলেও তিন বছর ধরে আমি, কিছলু ভাই, রবি আর পল্লব একসঙ্গে থাকি। এর মধ্যে আমরা ছয়বার বাসা বদলও করেছি। আমরা এখন যে বাসাটায় থাকি তার আগের বাসার বাড়িওয়ালা খুব টিপটপ ধরনের মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে তো ফিটফাট হয়ে চলতেনই, বাড়িটাকেও রাখতেন টিপটপ। কোনো একটা ময়লা কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে তিনি নিজ হাতে সেটা তুলে ফেলে দিতেন। তো একদিন কিছলু ভাইয়ের বাবা আমাদের এখানে কী একটা কাজে এসেছেন, তার কিছুক্ষণ পর আমার বাবাও এসেছিলেন। দুজনই আবার গ্রাম থেকে নিজ গাছের কলা নিয়ে এসেছেন। কলায় রুম সয়লাব। খাওয়াও হচ্ছে ইচ্ছেমতো। জাবর কাটা ছাগলের মতো একটু পরপরই আমরা সবাই কলা চিবুতে থাকি। একদিন রাতে হঠাৎ রুমের বাইরে ধপাস করে শব্দ হতেই আমরা বাইরে এসে দেখি বাড়িওয়ালা বারান্দার মেঝেতে বসে কাতরাচ্ছেন। দু হাত দিয়ে কোমড় চেপে ধরে উহ্-আহ্ করছেন তিনি। আমরা কাছে এগিয়ে তার পাশে বসতেই তিনি উহ্-আহ্ থামিয়ে পায়ের কাছ থেকে একটা কলার খোসা তুলে আমাদের নাক-বরাবর ধরে বললেন, 'এটা এখানে

কে ফেলেছে?’

কিছলু ভাই আমতা আমতা করতে লাগলেন। আমি সেই ফাঁকে বলে ফেললাম, ‘কেন চাচা, কী হয়েছে?’

রাগে বুম হয়ে বাড়িওয়ালা বললেন, ‘কী হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছ না!’

বাড়িওয়ালার দিকে একটা সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, ‘জি, এখন দেখতে পাচ্ছি।’

‘এই আকামটা কে করেছে?’

‘কোন আকামটা?’

আগের চেয়েও রেগে গিয়ে কলার খোসাটা আমাদের নাক-বরাবর দোলাতে দোলাতে বাড়িওয়ালা বললেন, ‘এই যে জিনিসটা দেখছ, যেটার ভেতর-বাহির পুরোটাই ছাগলে খায়, আর মানুষ খায় কেবল ভেতরটা, বাইরেরটা দেয় ফেলে, এটা এখানে কে ফেলেছে?’

‘আমরা কীভাবে বলব চাচা?’ চেহারাটা যতটা সম্ভব কাতরতায় ভরে তুলে বাড়িওয়ালার দিকে তাকালাম।

‘তোমরা জানো না কে ফেলেছে?’

‘না-য়া-য়া।’ না শব্দটা বলতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে প্রায় তিন গুণ সময় নিলাম শব্দটা বলতে।

বাড়িওয়ালা যতটা সম্ভব চোখ দুটো বড় করে তাকালেন আমাদের দিকে। লালচে একটা ভাব এসেছে তার চোখের মাঝে। তিনি একটু উঠে বসে বললেন, ‘তোমরা জানো না কে ফেলেছে এটা?’

আমি আবার আকাশ থেকে পড়ার মতো চোখ দুটো একটু বড় করে প্রলম্বিত স্বরে বললাম, ‘না-য়া-য়া।’

একদম সোজা হয়ে বসলেন বাড়িওয়ালা। আমার দিকে স্থির চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘এই ছোকরা, বেশি পাকা হয়ে গেছ, না? তোমার বয়সে আমি এরচেয়ে বেশি পাকা ছিলাম।’

‘জি, আপনাকে দেখেই তা বোঝা যায়।’

‘কী!’ বাড়িওয়ালা আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিছলু ভাইয়ের দিকে তাকালেন, ‘আপনি তো এদের গুরু, কিন্তু আপনার শিষ্যদের মাথায় তো কোনো মগজ নাই।’ বাড়িওয়ালা এবার আমার দিকে তাকালেন, ‘এই ছোকরা, তুমি তো মগজ ছাড়া মনুষ, মগজ ছাড়া একটা মানুষ কত দিন বাঁচতে পারে জানো?’

‘ঠিক বলতে পারব না। আচ্ছা, আপনার বয়স কত?’

রাগের চরম মাত্রায় পৌঁছে গেলেন বাড়িওয়ালা। তিনি কিছলু ভাইয়ের দিকে আগুন-চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমি জানি এ কলার খোসাটা এখানে কারা ফেলেছে। কদিন ধরেই দেখছি বানরের মতো সবাই কলা চিবিয়ে যাচ্ছেন। কলা খাবেন আপনারা আর খোসায় পা রেখে আছাড় খাব আমি, তা হতে পারে না। আপনারা এখনই বেরিয়ে যান, আর এক মুহূর্ত থাকতে পারবেন না এ বাড়িতে, আপনাদের আমি আর রাখব না।'

কিছলু ভাই কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'এটা আপনি কী বলছেন চাচা!'

'কী বলছি শুনতে পান নাই?'

আমি একটু সোজা হয়ে বসে বললাম, 'আপনি অবিবেচকের মতো কথা বলছেন কেন! এত রাত করে আমরা কোথায় যাব?'

'তোমরা কোথায় যাবে তার আমি কী জানি!'

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছলু ভাই পা চেপে ধরলেন বাড়িওয়ালার, তারপর প্রায় কেঁদেই ফেললেন। এ ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। এত রাতে আমরা কোথায়ই বা যাব, তা ছাড়া মাসের এই মধ্য সময়ে নতুন কোনো বাসা ভাড়া পাওয়াও মুশকিল। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হবে, এত রাতে কোথাও খালি বাসা পেয়ে ভাড়া চাইতে গেলে বাড়িওয়ালা নির্ঘাত ভাববে, মেয়েলি কিংবা চুরি-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে আমাদের।

কিছলু ভাই পা ধরে রাখার প্রায় পনেরো মিনিট পর বাড়িওয়ালা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এ মাসের বাকি সময়টা থাকতে দিলাম আপনাদের, মাস শেষ হওয়ার পর এক দিন কি, এক সেকেন্ডও না।'

মাস শেষ হওয়ার এক দিন আগেই বাসা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা। তার আগে একটা কাজ করেছিলাম আমি—আমরা যে বাথরুমটা ইউজ করতাম, সিমেন্ট আর ইটের খোয়া মিশিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলাম তার কমোডটা। শালা, এবার কমোড ঠিক কর!

কথাটা মনে পড়তেই হাসতে থাকি অমি। কিছলু ভাই আমার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললেন, 'হাসছ কেন?'

'আপনার সেই কথাটা মনে আছে?'

'কোন কথাটা?'

'ওই যে কলার খোসা, রাত করে বাসা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি, বাড়িওয়ালার পায়ে ধরা, কমোডে সিমেন্ট...।'

গম্ভীর হয়ে যান কিছলু ভাই, 'মিয়া, সেদিনের কথা মনে করে হাসছ। সে

রাতে যদি পায়ে না ধরতাম তাহলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হতো, ঘুম আস্‌লে কুত্তার সাথে ডাস্টবিনের পাশে ঘুমাতে হতো।'

'একটা কথা বলি কিছলু ভাই?'

'বলো।'

'আপনি কি বাসা ভাড়া নিতে গিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলার পর আজও পা ধরেছিলেন বাড়িওয়ালার?'

'ওই মিয়া, মশকারা কর আমার সঙ্গে!' কিছলু ভাই আবার গম্ভীর হয়ে যান, 'শোনো অর্ণক, বাড়িওয়ালার সঙ্গে যত সমস্যা সৃষ্টি কর তুমি। আমরা আজ যে বাসাটা ঠিক করলাম, আগামী মাসে সে বাসাটায় উঠব। তার আগে কয়েকটা কথা আছে।'

বিছানার ওপর আবার পা তুলে বসি আমি। কিছলু ভাইয়ের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলি, 'কী কথা?'

'নতুন বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিছু নিয়ম পালন করতে হবে।'

'নিয়মগুলো কী, বলুন?'

'এক. রাত দশটায় বাসার বাইরের গেট বন্ধ হয়ে যাবে, এর মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে। যে সবচেয়ে পরে আসবে, গেট সে নিজ দায়িত্বে বন্ধ করবে, দুই. পানির ট্যাপ ঠিকমতো ব্যবহার করতে হবে, একটুও যেন পানি নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিন. ছাদে...।'

'ছাদে উঠে আড্ডা দেওয়া যাবে না। কোনো প্রয়োজনে উঠলেও পাশের বাসার ছাদের দিকে তাকানো যাবে না, সিঁড়িতে ময়লা ফেলা যাবে না, বাথরুম পরিষ্কার রাখতে হবে, মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া পারিশোধ করতে হবে, জোরে টিভি চালানো কিংবা গান বাজানো যাবে না, এই তো?'

'না, আরো আছে।'

'কী?'

'বাড়িয়ালার তিনটি অবিবাহিত মেয়ে আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, তাকানোও যাবে না তাদের দিকে।'

'তারা যদি তাকায়?'

'তাদের বাড়ি তারা যেখানে খুশি সেখানে তাকাতেই পারে।'

'তারা তাকালে দোষ না, আমরা তাকালে দোষ?'

'অর্ণক—।' কিছলু ভাই আমার দিকে একটু নরম করে তাকিয়ে বলেন,

'মাঝে মাঝে তুমি অনেক ডিস্টার্ব কর, প্লিজ নতুন বাসায় গিয়ে কোনো ডিস্টার্ব কোরো না, কোনোভাবেই বাড়িওয়ালার মেয়েদের দিকে তাকিয়ো না, প্লিজ, প্লিজ।' কিছলু ভাই আমার হাত চেপে ধরেন।

সাত মাস হলো আমরা এ বাসায় আছি। একবারের জন্য হলেও বাড়িওয়ালার মেয়ের দিকে আমি তো নই-ই, কেউই তাকায়নি। যদি হঠাৎ বাসার বাইরে দেখা হয়, তৎক্ষণাৎ আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, রাস্তার পাশে ডাস্টবিনের ময়লা আর রোম ওঠা কুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকি, তাও বাড়িওয়ালার মেয়ের দিকে তাকাই না। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা বোরকা কিনে নেব। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় সেটা একবার পরব আর ঢোকার সময় একবার পরব।

তবে বাড়িওয়ালার নিয়মকানুনের পাশাপাশি আমরাও, বিশেষ করে আমি একটা নিয়ম মেনে চলি। এ বাসার বারো ইউনিটের যাদের বাসায় আমার বয়সী কিংবা এর চেয়ে একটু ছোট বা একটু বড় মেয়ে আছে, তাদের চেহারা-সুরত যা-ই হোক, তাদের বাবা-মাকে আমি যথাক্রমে আঙ্কেল-আন্টি ডাকি, যাদের নেই তাদের ডাকি ভাই-ভাবি। খায়রুল ভাইয়ের আমার বয়সী কিংবা এর চেয়ে একটু ছোট বা বড় মেয়ে নাই বলে স্বভাবতই তাকে ডাকতাম ভাই বলে। কিন্তু কাল বিকেলেই প্রথম জানলাম খায়রুল ভাইয়ের নয় বছর বয়সের মেয়ে ছাড়াও আরো একটা মেয়ে আছে, যে আমার বয়সী, যে বরিশাল মেডিকেলে পড়ে, যে সামার ভ্যাকেশনে বেশ কয়েক দিনের জন্য এখানে আসছে। জানার পর রাতে কেবল ঘুমিয়েছি, নিয়মবহির্ভূত খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, তারপর মাত্র দশ সেকেন্ডের চিন্তায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি—না, খায়রুল ভাই আর ভাই না, তিনি এখন আঙ্কেল, খায়রুল আঙ্কেল।

মসজিদের ইমাম সাহেবকে সালাম দিতে আমার মিস হয় কিন্তু খায়রুল আঙ্কেলকে হয় না। কোনো কারণ-অকারণ না, ইদানীং দেখা হলেই তাকে সালাম দিই আমি। কোনো কোনো সময় দেখা যায় খায়রুল আঙ্কেল দ্রুত কোথাও যাচ্ছেন, আমি তার পেছনে, মুখোমুখি হতে পারছি না তার, পাশাপাশিও হতে পারছি না, যেতে যেতে তিনি আড়াল হয়ে গেছেন, তাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, কেবল তার ছায়া দেখা যাচ্ছে, আমি তখন তার ছায়াকেও সালাম দিই, পরম ভক্তিসহকারে দিই।

সুযোগ পেলে তার সামনে অতি ভদ্র ছেলে হয়ে হাঁটাহাঁটিও করি, চোখ দুটোর মাঝে সূক্ষ্ম একটা দার্শনিক ভাব এনে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকি, আগে যে বিভিন্ন স্টাইলের গেঞ্জি পরতাম, তার বদলে ফুলহাতা শার্ট পরি, আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদে যাই। সবচেয়ে বড় কথা, সমকালীন রাজনীতি নিয়ে তার সঙ্গে আলাপও করি। এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কোনোরকম তর্কে যাই না, রাজনীতি-রাজনীতিবিদ নিয়ে তিনি যে যুক্তি দেন তা নির্দ্বিধায় মেনে নিই রিমান্ডে নেওয়া কোনো দুর্নীতিবাজের মতো।

তবে সেদিন একটা ফ্যাকড়ার মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলাম। মতলব চাচার চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম খায়রুল আঙ্কেল বসে আছেন সেখানে। যথারীতি তাই মাথা নিচু করে হাঁটছিলাম। আমাকে দেখেই আঙ্কেল ডাক দিলেন, 'ছোট ভাই, এদিকে আসো।'

বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল আমার। ভালো লাগা একটা বোধ নিয়ে যে এতক্ষণ ছিলাম, সেটা কেমন যেন পানসে হয়ে আসে, আমার স্বপ্নগুলো প্রচণ্ড ঝড়ের বাতাসে খড়-কুটোর মতো উড়তে থাকে, আমি টের পাই আমি আর নাই, মিশে যাচ্ছি বাতাসের সাথে, একেবারে, চিরতরে। খায়রুল আঙ্কেল আমাকে

ভাই ডাকলে সবকিছু যে ওলটপালট হয়ে যায়! ভাই-ভাতিজি-চাচা অঙ্ক যে মেলে না! হাহাকার করে উঠি নিঃশব্দে। একটু পর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করি। তারপর বিনীত ভঙ্গিতে আঙ্কেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, শিষ্টতা মেখে নিয়ে ডান হাতটা কাঁপা কাঁপা ভঙ্গিতে বুক-বরাবর তুলি, বিনয় ঢেলে চেহারা পাল্টে ফেলি, গলার স্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করে তুলে বলি, 'আস্সালামু আলাইকুম।'

খায়রুল আঙ্কেল মুচকি হাসেন। ইশারায় আমাকে পাশে বসতে বলেন। যতটা সম্ভব বিনয়ী দূরত্ব বজায় রেখে আমি তার পাশে বসি। তিনি চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলেন, 'চা খাবে?'

গলার ভেতর থেকে স্বর বের হয় কি হয় না এমন ভঙ্গিতে বলি, 'জি না।'

'কেন?'

'আমি চা খাই না।'

মাথা নিচু করতে করতে এক পলক খায়রুল আঙ্কেলের মুখের দিকে চাইতেই দেখতে পাই, কপাল কুঁচকে ফেলেছেন তিনি। আমার দিকে অবাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আছেন। আমি সমস্ত সরলতায় আমার চোখ, নাক, ভ্রূ, কান, ঠোঁটকে সরল করে ফেলি। পিঠে একটা হাত রাখেন খায়রুল আঙ্কেল, 'কই, তুমি তো কদিন আগেও আমার সঙ্গে চা খেয়েছ।'

খুক্ করে একটু কেশে বলি, 'জি।'

'তাহলে?'

'ইদানীং পড়াশোনায় বেশ চাপ পড়েছে, অনেক রাত জেগে পড়তে হয় তো।'

'রাত জাগার জন্য তো চা-ই খেতে হয়।'

'আমার বেলায় আবার উল্টোটা। চা খেলেই কেমন যেন ঘুম পেয়ে যায় আমার।'

'তাই নাকি!' খায়রল আঙ্কেল অবাক হওয়া স্বরে বলেন, 'তা তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি তো?'

'না না, কোনো অসুখ নেই আমার শরীরে, একদম ফিট আমি।' ফিট বলে একটু মোচড় দিতেই শরীরের নিচের অংশটায় বেশ ব্যথা জেগে ওঠে। সকালবেলা রক্তে ভাসিয়ে ফেলেছিলাম বিছানাটা। পাইল্সটা একটু বেড়ে গেলেই এ সমস্যাটা সৃষ্টি হয় আমার।

'তবু একবার ডাক্তার দেখিয়ো।'

'অবশ্যই। আপনি যেহেতু বলছেন তাহলে অবশ্যই একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। আঙ্কেল— ।' খায়রুল আঙ্কেলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলি, 'আমার কেন যেন মনে হয় একটু বয়স হলে তার চা খাওয়া উচিত। আমাদের বয়সের কাউকে চা খেতে দেখলে আমার কেমন যেন লাগে, মনে হয় ছেলেটা এক ধরনের নেশা করছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে।'

'গুড, ভালো বলেছ তো তুমি! আমারও এমন মনে হয়। যাক, তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল পাচ্ছি।'

'জি। আপনি খুব ভালো একটা মানুষ, আপনার মতো হতে পারাটা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।'

'তা কোথায় যাচ্ছিলে তুমি?'

'এই তো, সামনে একটু কাজ ছিল।'

'যাও, আমি একটু বাজারে যাচ্ছি ভালো কিছু মাছ কিনতে। জানো তো, আমার বড় মেয়েটা এসেছে।'

'কে?'

'আমার বড় মেয়ে।'

'তাই নাকি!' রাজকন্যা যে এসেছে তা তো জানি। তবু চোখ দুটো যতটা সম্ভব বড় করে ফেলি আমি, যেন এ সংবাদটা না জানাতে অনেক অন্যায় হয়ে গেছে আমার। অপরাধী গলায় মিনমিন করে বলি, 'কদিন থাকবেন তিনি?

'থাকবে বেশ কদিন। সামার ভ্যাকেশন চলছে তো।' খায়রুল আঙ্কেল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেন, 'জানো, আমার এ মেয়েটা এত লক্ষ্মী হয়েছে না!'

'তা তো হবেই, কার মেয়ে দেখতে হবে না!' কথাটা বলেই আমি কেমন যেন হয়ে যাই। আমার দু হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি হাত দুটো পরস্পর পরস্পরকে কচলাচ্ছে। আকস্মিক নয়, ক্রমান্বয়ে আমার এ পরিবর্তনে আমি যতটা না অবাক হচ্ছি, তার চেয়ে হচ্ছি মুগ্ধ। জ্ঞানীগণ বলেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তিত হতে পারে, সে-ই জ্ঞানী। তাহলে কি আমি জ্ঞানী হয়ে যাচ্ছি!

'ভালো কথা, তুমি সময় করে একবার বাসায় এসো তো, আমার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

পেটের ভেতর চিঁউ করে ওঠে আমার, কলজেটা লাফাতে থাকে, কানের দুপাশ হঠাৎ ভিজে ওঠে, কিন্তু সম্পূর্ণ বুকটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়, মনে হয় কত দিন বুকভরে নিঃশ্বাস নিই না!

'জি যাব, আন্টির সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না।'

'হ্যাঁ, তোমার ভাবি— ।' থেমে যান খায়রুল ভাই। আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থেকে বলেন, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে আগে ভাই বলে ডাকতে না? আমার স্ত্রীকে ভাবি?

'জি।'

'ইদানীং আঙ্কেল বলে ডাকছ যে?'

'একটা কারণ আছে আঙ্কেল।'

'কারণ!'

'জি।' আমার হাত দুটো আবার এক হয়ে এসেছে, পরস্পর পরস্পরকে কচলাচ্ছে। আমি আবার মুগ্ধ হয়ে যাই আমার এ পরিবর্তনে, 'আঙ্কেল, প্রথম দিন থেকেই আপনাকে কেন যেন আমার ভালো লেগে যায়, খুব পছন্দ করে ফেলি আপনাকে, আপনাকে দেখলেই এক ধরনের ভক্তি এসে বুক ভরে যায়, মনে হয় শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধায় আপনাকে সারাক্ষণ মনে রাখি। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো— ।' থেমে যাই আমি। চোখের কোণ দিয়ে খায়রুল আঙ্কেলকে একবার দেখে নিই। মুগ্ধতায় ভরে গেছেন তিনি, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন মুগ্ধ চোখে।

'তা হঠাৎ করে কী মনে হলো?' খায়রুল আঙ্কেলের গলার স্বরটাও কেমন যেন মুগ্ধতায় ভরে গেছে।

কিছুটা লাজুক করে ফেলি আমার চেহারাটা। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বেশ নিচু স্বরে বলি, 'ভাই ডাকটার মধ্যে কেমন যেন শ্রদ্ধা খুঁজে পাই না আমি, মনে হয় সাধারণ কোনো সম্বোধন, কিন্তু আঙ্কেল ডাকটার মধ্যে অপরিসীম একটা শ্রদ্ধা এসে গলার কাছে ঘুরপাক খায়, কেমন যেন একটা আন্তরিকতা এসে মাখামাখি হয়ে যায়। আঙ্কেল হচ্ছে বাবার ভাই, বাবার মতো, এক ধরনের বাবা। আপনাকে আমার মাঝে মাঝে বাবা বলেও— ।' আবার থেমে যাই আমি।

খায়রুল আঙ্কেল আমার মাথায় হাত রাখেন। আমি টের পাই সে হাতের মধ্যে বাবার ছোঁয়া রয়েছে, প্রচ্ছন্ন একটা স্নেহ রয়েছে, প্রশ্রয়ও রয়েছে অবারিত। একটু পর তিনি উঠে গিয়ে বাজারের দিকে হেঁটে যান। আমি মাথা নিচু করেই রাখি, অনেকক্ষণ। খায়রুল আঙ্কেল চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত চোখ তুলি না আমি।

অবশেষে চোখ তুলে তাকাই, খায়রুল আঙ্কেলকে আর দেখা যাচ্ছে না।

আমি এবার মতলব চাচার দিকে তাকাই। নিবিষ্ট মনে একটা বিড়ি ফুঁকছেন তিনি, সঙ্গে চা-ও খাচ্ছেন এক কাপ। জিভ সুড়সুড় করছে আমার, অনেকক্ষণ কথা বলেছি, চায়ের প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। মতলব চাচার চা খাওয়া দেখে সুড়সুড়টা বেড়ে গেল আরো। প্রগাঢ় অনুভূতি নিয়ে চাচাকে বললাম, 'চাচা, এক কাপ চা হবে, চিনি একটু বেশি।'

চোখ দুটো ভাবলেশহীন করে চাচা আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'জি, চা চেয়েছি অমি, চিনি একটু বেশি।'

প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে চা বানাতে থাকেন মতলব চাচা, ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকান, বিশ্বাস করার চেষ্টা করেন কিছুক্ষণ আগে চা খেতে না চাওয়া সেই আমি আর এখন চা খেতে চাওয়া এই আমি এক কি না। মিটিমিটি হাসি আমি, মনে মনে একটা কথা বলে একটু শব্দ করেও হাসি। হাসির শব্দে মতলব চাচা আমার দিকে তাকাতেই আমি বলি, 'চাচা, শরীরটা কেমন, ভালানি?'

সুবীরের সেলুনের কাছে এসে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করি। না, আপাতত সেলুনে কেউ নেই। আমি সেলুনের ভেতর ঢুকে একটা চেয়ারে বসে সুবীরকে বলি, 'একটা ভদ্রলোকের মতো ছাঁট দিয়ে দে তো সুবীর?'

'দাদা, কয়দিন আগেই না চুল কাটলেন আপনি।'

'কদিন আগে চুল কাটলে কি এখন কাটা যাবে না?'

'তা যাবে না কেন, যাবে।'

'তাহলে দে। স্টাইলটা চেঞ্জ হবে, ভদ্রলোকি স্টাইল।'

সুবীর একটু এগিয়ে এসে অবাক হয়ে বলে, 'আপনি না অন্য স্টাইলে চুল কাটেন দাদা।'

'তা কাটি। এবার একটু অন্য রকম করে দে না। সামান্য স্টাইল থাকবে, সামান্য ভদ্রতাও থাকবে।'

'দাদা, হঠাৎ এ স্টাইল?'

মুচকি হাসি আমি, সুবীরের কথার কোনো জবাব দিই না। ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলুনের বড় আয়নাটার দিকে ভালো করে তাকাই। সম্পূর্ণ নিজেকে দেখি—না, আমি ঠিকই আছি। আমি, আমার ভেতরটা, সব ঠিক আছে। 'সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা কত আমোদ প্রমোদে হাসে'–এবার আমাকে দেখেও হাসবে, বিগলিত হাসি।

চুলকাটা শেষ করেই তাই সোজা চলে গেলাম খায়রুল আঙ্কেলের বাসায়। টুং করে কলবেল বাজাতেই দরজা খুলে একটা মেয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। কলবেলের চেয়েও মিষ্টি স্বরে বলল, 'কাকে চাই?'

'খায়রুল আঙ্কেল আছেন?'

'না, আব্বু তো বাজারে।'

'ও হ্যাঁ, একটু আগে তো বাজারে যেতেই দেখলাম। ঠিক আছে পরে আসব আমি।'

মেয়েটি দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, তার আগেই বললাম, 'শুনুন?'

দরজা বন্ধ হওয়া থেমে গেল। চোখের পাপড়ি দুলিয়ে উৎসুক চোখে তাকাল মেয়েটি। আমিও তাকালাম, দেখলাম তাকে। বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হতে হতে সেটা গরম হওয়া শুরু হতেই আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আগুনে পতঙ্গ পোড়ে, আমি পুড়তে লাগলাম রূপে। এ মুহূর্তে কিছলু ভাইকে প্রয়োজন, ভীষণ প্রয়োজন!

আমাদের মহল্লায় যতগুলো প্রেম সংঘটিত হয়, তার সবই হয় কিছলু ভাইয়ের কল্যাণে। আমরা এর আগে যে মহল্লায় ছিলাম, সেখানেও এ রকম সুনাম ছিল তার, এখানে এসেও সে সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। বাসা পাল্টিয়ে যে মহল্লায়ই তিনি যান না কেন, কেমন করে যেন কয়েক দিনের মধ্যে সবাই জেনে যায় তিনি একজন প্রেমবিশারদ, সর্বোপরি প্রেমের চিঠি লেখায় বিশারদ। মোবাইলের এ যুগেও চিঠির এখনো আলাদা একটা গুরুত্ব আছে। তার প্রেমপত্র পড়লেই মেয়েরা কেমন যেন গায়ে হাত-বোলানো বিড়ালের মতো চুপ হয়ে যায়, আয়েশে চোখ বুজে ফেলে, আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে পরম তৃপ্তিতে।

কিছলু ভাই এ পর্যন্ত যতজনকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, তারা প্রায় প্রত্যেকেই সফল। ইদানীং এ ব্যাপারটা অনুধাবন করে তিনি তার চিঠি লেখার রেটও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগে চিঠিপ্রতি লিখতে নিতেন পঞ্চাশ টাকা, এখন একশ টাকা। এক লাফে চার্জ ডবল করায় কেউ কেউ গাঁইগুঁই করলেও অনেকেই তেমন উচ্চবাচ্য করেনি। করবেই বা কেন, মানুষ প্রেম করার জন্য কত কি করে, আর এ তো মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেশি।

কিন্তু একটা অপূর্ব সুযোগ হচ্ছে, চিঠিতে কাজ না হলে তার মূল্য ফেরত।

কিছলু ভাই একবার বিফল হয়েছিলেন, ভয়াবহ বিফল। একটা ছেলেকে তিনি একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। কিছলু ভাইয়ের এক মহান গুণ হচ্ছে যার জন্যই তিনি চিঠি লেখেন না কেন, তা রবি, পল্লব আর আমাকে পড়ে শোনান। সেই চিঠিটিও পড়ে শোনালেন।

আমার পরানের ফুল

কোন ফুলের সঙ্গে তোমাকে তুলনা করব যে তা ভেবে আমি ব্যাকুল, কারণ তুমি নিজেই তো ফুল। তবে তুমি কোন ফুল গো- চম্পাকলি, জুঁই, গোলাপ, না বকুল? যা-ই হও, তুমি ফুল, তুমি জগতের সেরা ফুল। তোমাকে দেখলে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে,

হাতে নিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে, কখনো কখনো চোখের সামনে মেলে ধরে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ওগো আমার মনোমোহিনী ফুল, একবার আসবে কি আমার খুব কাছে, আসবে কি আমার হাতের মুঠোয়, হাতে নিয়ে তোমাকে শুধু শুঁকতাম আর শুঁকতাম।

যদি না আসো, তবে বুঝব তুমি... না থাক—
কী করে বোঝাব তোমায় ওগো আমার প্রাণের ফুল
তোমাকে ভালোবেসে যদি করে থাকি ভুল
তবে কাছে এসে টেনে তোলো আমার মাথার চুল!

ইতি তোমার ভ্রমর।

তিন দিন পর সেই ছেলেটা এসে উপস্থিত। এসেই সে কিছলু ভাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে মরা কান্না জুড়ে দিল। কিছলু ভাই তাকে টেনে তুলে যতই জিজ্ঞেস করেন কী হয়েছে, সে কিছুই বলে না, আরো শব্দ করে কাঁদতে থাকে। শেষে বিরক্ত হয়ে কিছুটা চিৎকার করে ওঠেন কিছলু ভাই, 'এই ছেলে, কী হয়েছে তোমার!'

চোখ তুলে ছেলেটা একবার কিছলু ভাইয়ের দিকে তাকায়, তারপর আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিছলু ভাই আবার জিজ্ঞেস করেন, 'বলবে তো কী হয়েছে তোমার!'

ছেলেটা এবার মাথা না তুলেই বলে, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কী সর্বনাশ হয়েছে তা বলবে তো!' কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলেন কিছলু ভাই।

'আমি তা বলতে পারব না।'

'না বললে বুঝব কী করে?'

'আমি তো আপনাকে বোঝাতে আসিনি।'

'তাহলে কেন এসেছ?'

'আপনি আমার এত বড় সর্বনাশ কেন করলেন?' ছেলেটা এবার কিছুটা চিৎকার করে ওঠে।

কিছলু ভাই একটু শান্তভাবে বলেন, 'তোমার কী সর্বনাশ করেছি, বলো তা?'

'আমার সব সর্বনাশ করেছেন আপনি।' ছেলেটা আর কিছু বলে না, চুপ

হয়ে যায়।

'আমার লেখা চিঠিটা তোমার কাজে লাগেনি তাই তো?' কিছলু ভাই ছেলেটার একটা হাত ধরে বলেন, 'ঠিক আছে, আরেকটা চিঠি লিখে দেব, এর জন্য তোমাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না, একেবারে ফ্রি। কী, এবার খুশি তো?'

ছেলেটা খুশি হয় না বেজার হয় তা বোঝা যায় না। কোনো কথা না বলে সে আস্তে আস্তে কিছলু ভাইয়ের রুম থেকে বের হয়ে যায়।

তার দু দিন পর হঠাৎ এক মহিলা এসে উপস্থিত। ছয়তলা সিঁড়ি ভেঙে উঠে তিনি এমনভাবে হাঁপাতে থাকেন, আমার মনে হলো আর এক তলা যদি উঠতে হতো তাকে, তাহলে তার গলার ভেতর থেকে সবটুকু জিভ বের হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেত। দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান বেশ ওজনদার মহিলাটি হাঁপাতে হাঁপাতেই বললেন, 'এখানে কিছলু কার নাম?'

কিছলু ভাই বাসায় ছিলেন না, বাজার করতে বাইরে গিয়েছিলেন। পল্লবও ঘরে নেই। ঘরে কেবল আমি আর রবি। রবি আবার টয়লেটে, ওর কমপক্ষে আধঘণ্টা লাগে ওখানকার কর্ম শেষ করতে।

যতটুকু বিনয় ছিল আমার মধ্যে সবটুকু ঢেলে দিয়ে আমি মহিলাটিকে বললাম, 'কিছলু ভাইয়া তো বাসায় নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'একটু বাইরে গেছে।'

'একটু বাইরে কোথায়?'

'এই মানে...বাইরে আর-কি।'

'কখন আসবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না।'

'কিছলু তোমার কে হয়?

'তেমন কেউ না, আমরা একসঙ্গে থাকি আর-কি।'

'তোমার নাম?'

অল্প অল্প পা কাঁপতে শুরু করে আমার। বিপদের একটা হাওয়া লাগে আমার গায়ে। ভাবতে থাকি—আসল নাম বলব, না বানিয়ে একটা নাম বলে দেব। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর থেকে জানান দেয়—ওহে অর্ণক, আসল নাম বলিস না, নকল নাম বল।

'এই ছেলে, দাঁড়িয়ে থেকে কী ভাবছ, তোমার নাম জিজ্ঞেস করলাম না!'

'জি, আমার নাম কামাল।'

'শোনো কামাল, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথাবার্তা বলছ। এই আমি বসলাম, কিছলুর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আজ আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।' মহিলা বিছানার ওপর বসে পড়েন।

মুখটা হাসি হাসি করে ফেলি আমি। এ ছাড়া এ মুহূর্তে কিছু করার নেই আমার। পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে আছেন মহিলা। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমারও ভালো লাগত তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। কিন্তু তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, সাত দিন না খাওয়া কোনো মানুষও কোনো খাবারের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকে না।

'এই ছেলে, বসো।'

আমি আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকি, বসি না।

'কী হলো, বসছ না কেন? কাঠের ওই চেয়ারটা টেনে এনে আমার সামনে বসো।'

চেয়ার টেনে তার সামনে না নিয়ে আমি একটু দূরেই বসি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু ঝুঁকে বসেন আমার দিকে। তারপর আমার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে কী যেন ভাবেন। শেষে বলেন, 'বলো তো মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কী?'

'টয়লেট।'

'কী!'

'জি টয়লেট।' এ মুহূর্তে রবিকে বেশ ঈর্ষা করতে থাকি আমি।

'তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছ?' মহিলা কিছুটা চিৎকার করে বলেন।

'আপনার সঙ্গে তো আমার ইয়ার্কির সম্পর্ক না ভাবি।'

মহিলা একটু হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, অনেকেই আমাকে দেখে আন্টি বলে, খালাম্মা বলে। তোমাকে ধন্যবাদ ভাবি বলার জন্য।'

'থ্যাঙ্ক ইউ দেওয়ার কিছু নেই ভাবি। আমি এমন কিছু ছেলেকে জানি, যারা কেবল সুন্দরী মহিলা দেখলে ভাবি বলে, আমার কাছে ও-রকম কোনো বাছবিচার নেই, কুৎসিত মহিলাকেও আমি ভাবি বলি।'

'কী!'

এমন সময় টয়লেটের দরজা খুলে রবি উঁকি দিয়ে বলে, 'অর্ণক, পানি নাই, বাড়িওয়ালা হারামজাদাকে পানি ছাড়তে বল তো?'

মহিলা ঝট করে বিছানা থেকে নেমে খুব দ্রুতগতিতে টয়লেটের দরজার

সামনে গিয়ে দাঁড়ান। রবি মহিলার দৌড়ে আসা দেখে চমকে উঠে যেই না দরজা বন্ধ করতে যাবে, তার আগেই তার বিশাল হাত দিয়ে দরজাটা চেপে ধরেন তিনি। খালি গা, পানিতে ভেজা, পরনে গামছার মতো কী একটা যেন, সেটাও ভেজা, লজ্জায় কেমন যেন কুঁকড়ে যায় রবি। মহিলা তবু দাঁড়িয়ে থাকেন সোজা হয়ে এবং সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, তিনি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন রবির দিকে। রবি হঠাৎ কিছুটা রেগে গিয়ে মহিলাকে বলে, 'এভাবে তাকিয়ে কী দেখছেন?'

'তোমাকে দেখছি।'

'কে আপনি?'

'আমি কে সেটা বড় প্রশ্ন না। তার আগে বলো তুমি কে, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম রবি।'

'ঠিক বলেছ, না মিথ্যা বলেছ?'

'মিথ্যা বলতে যাব কেন?'

'মিথ্যা বলে পারও পাবে না।' মহিলাটি একটু পিছিয়ে এসে বলে, 'কিছলু কে?'

'আমরা একসঙ্গে থাকি, ভাই বলে ডাকি।'

'কোথায় গেছে সে?'

রবি টয়লেট থেকে গলা বাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'অর্ণক, কিছলু ভাই কোথায় গেছে রে?'

আমি কিছু বলার আগেই মহিলা রবির দিকে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী নাম বললে ওর?

'কেন, অর্ণক!'

'এই—,' মহিলা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ান, 'একটু আগে তুমি যেন তোমার নামটা কী বলেছিলে?'

আমি অবাক হওয়ার মতো চোখ দুটো সামান্য বড় করে বলি, 'আমি অন্য কোনো নাম বলেছিলাম নাকি!'

'তোমার কী মনে হয়?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

মহিলা সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চোখ দুটো সরু করে তাকান। তারপর একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'খুব চালাক হয়ে গেছ, না? নাক টিপলে

এখনো দুধ বের হয়ে আসবে, আর আমার সঙ্গে চালাকি! গরু কোথাকার! মানুষ আর একটা গরুর মধ্যে পার্থক্য কী জানো তো?'

'জানি। মানুষ পা দিয়ে হাঁটে, গরু হাত-পা দুটো দিয়েই হাঁটে।'

'তাই?' মহিলাটির রাগ বেড়ে যাচ্ছে। তিনি আবার বিছানায় গিয়ে বসেন। তারপর আমার দিকে আবার তাকিয়ে বলেন, 'মানুষ আর গরুর মধ্যে মিলটা কোথায়, তা জানো তো?'

'হ্যাঁ, এটাও জানি। ছোটকালে মানুষের বাচ্চাও গরুর দুধ খায়, গরুর বাচ্চাও গরুর দুধ খায়।'

'এই ছেলে দেখি আবোল-তাবোল কথা বলে বেশি। একটা গরু আর মানুষের মধ্যে মিল হচ্ছে, মানুষ কারণ-অকারণে বকবক করে, আর গরু কারণে-অকারণে হাম্বা হাম্বা করে।'

'হ্যাঁ, আপনাকে দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।'

রাগের চরম মাত্রায় পৌঁছে গেছেন মহিলা। তিনি কিছুটা কাঁপছেন। ঠোঁটও কাঁপছে তার। মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে তিনি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। একটু ভয় ভয় লাগছে আমার। কাছে এসে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মারবেন না তো মহিলা? থাপ্পড় খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই আমার, কিন্তু ওমন বড় আর মাংসযুক্ত হাতের থাপ্পড় খেতে একটু আছে।

মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমার বুকটার ভেতরেও ধুকপুক শুরু হয়ে যায়। তিনি যেই না আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখনই হনহন করে ঘরে ঢোকেন কিছলু ভাই। সারা শরীর ঘেমে ভিজে গেছে তার, একটু একটু হাঁপাচ্ছেন, চেহারাটাও কেমন যেন রাগী রাগী। বাজারের ব্যাগটা মেঝের ওপর ঠাস করে রেখে বলেন, 'আমাদের মতো গরিব মানুষদের প্রতিদিন বাজারে যেতে হয়, দিন এনে দিন খেতে হয়, কিন্তু বড়লোকরা?'

'বড়লোকেরা দিনে-রাতে সব সময় আনে, কিন্তু স্লিম থাকতে চাওয়ার কারণে ঠিকমতো খেতে পারে না।' কথাটা বলে আমি মহিলার দিকে তাকাই। কিছলু ভাইও হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানায় বসে মহিলার দিকে তাকান। তিনি ঘরে ঢুকে খেয়াল করেননি ঘরে নতুন কেউ একজন আছেন। মহিলার দিকে তাকিয়েই তিনি ভীষণ চমকে ওঠেন। মহিলা গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছেন কিছলু ভাইয়ের দিকে।

আস্তে আস্তে বিছানা থেকে আবার উঠে দাঁড়ান কিছলু ভাই। মহিলার

দিকে বিনয়ী চাহনি দিয়ে বলেন, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না?'

'কিন্তু আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।' মহিলা একটু থেমে বলেন, 'আপনার নাম কিছলু, না?'

'জি।' কিছলু ভাই কেমন যেন গদগদ হয়ে যান।

'আপনি তো খুব ভালো চিঠি লেখেন।'

'এই আর-কি।'

'তা চিঠিটা কাদের লেখেন?'

'আমার ক্লায়েন্টদের লিখে দিই।'

'ও, যারা আপনার কাছ থেকে চিঠি লিখে নেয় তারা আপনার ক্লায়েন্ট?' মহিলা কেমন যেন ব্যঙ্গ করে বলেন।

'অবশ্যই। আমি প্রতিটি চিঠি লিখে দিতে একশ করে টাকা নিই, তারা সেই টাকা দেয়ও, তাহলে তো তারা আমার ক্লায়েন্টই।'

'এসব চিঠি কাদের জন্য লেখেন আপনি?'

'কেন, আপনাকে কোনো চিঠি লিখে দিতে হবে?'

'ধরুন, আমি একটা চিঠি লিখে নিতে এসেছি। আপনি কল্পনা করুন তো আমি কার জন্য চিঠিটা নিতে এসেছি?' কিছলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মহিলা চোখ দুটো কুঁচকে ফেলেন।

কিছলু ভাই ভাবতে থাকেন, তিনি কী বলবেন তা মনে মনে সাজাচ্ছেন, কিন্তু চিরাচরিত সেই ব্যাপার হচ্ছে, বলার সময় তিনি আর তার সেই সাজানো কথাটা বলতে পারবেন না। আমি একটু এগিয়ে এসে মহিলাকে বললাম, 'মেয়েরা তো সাধারণত তার স্বামীর কাছে চিঠি লেখে না, যা বলার মোবাইল ফোনে অথবা টেলিফোনে সরাসরি বলে। চিঠি লেখে সাধারণত নতুন কোনো মানুষের কাছে।'

'এই ছেলে, তোমাকে কথা বলতে বলেছে কে?'

'কিছলু ভাই হচ্ছে আমাদের বস্, আমরা হচ্ছি তার শিষ্য। মাঝে মাঝে ক্লায়েন্টের সঙ্গে আমরাও কথা বলি, তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর-টুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি।'

কিছলু ভাই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'জি জি, ওরা আমার শিষ্য, ক্লায়েন্টের কোনো কোনো ব্যাপার ওরা ডিল করে। অর্ণক, তুমি বলো এবং কথা শেষ করো।'

খুক্ করে একটু কেশে আমি বলি, 'যা বলছিলাম, মানুষ সাধারণত নতুন

কোনো মানুষের কাছে কিছু বলতে চাইলে লজ্জা বা সংকোচের কারণে ফোনের বদলে চিঠিটাকেই বেছে নেয়। সে ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি, আপনি যদি কোনো চিঠির জন্য আসেন, তাহলে আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, আপনি ইদানীং কোনো পরকীয়ায় মজেছেন।'

'তাই?' মহিলা দাঁত কিটমিট করে কথা বলছেন, 'তা কোনো অল্পবয়সী ছেলে যদি চিঠি লিখে নিতে আসে, সে কার জন্য আসে?'

এবার আমি বলার আগেই কিছলু ভাই বলেন, 'অবশ্যই একটা মেয়ের জন্য আসে।'

'মেয়ের মায়ের জন্য আসে না তো?'

'ছি ছি, এটা আপনি কী বলছেন!'

মহিলা তার ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে মেলে ধরেন আমাদের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর কিছলু ভাই চমকে উঠি। পিঠে একটু খামচি অনুভব করতেই পেছনে তাকিয়ে দেখি, রবিও টয়লেট থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে, চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে ওরও। মহিলার হাতে সেই ছেলেটার চিঠি। মহিলা সেটা আমাদের নাকের সামনে ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছেন, 'এটা কার জন্য লিখেছেন আপনারা?' মহিলা চিঠিটি পড়তে থাকেন, 'আমার পরানের ফুল, কোন ফুলের সঙ্গে তোমাকে তুলনা করব যে তা ভেবে আমি ব্যাকুল, কারণ তুমি নিজেই তো ফুল।' মহিলা চিঠি পড়া বাদ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওই ছোকড়া অনেক দিন ধরে আমার মেয়ের পেছনে ঘুরঘুর করে, আর ও চিঠি লিখল কি না আমার নামে!'

'স্যরি, আপনার নাম কি ফুল?' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি আমি।

'তবে আর বলছি কী?'

'তাহলে হয়ে গেছে ভুল।'

'এবার ছিঁড়ব আপনাদের চুল।'

'ভাবি, চুল ছেঁড়ার আগে একটা কথা বলি, আসলে ওই ফুলটা আপনার নামের ফুল না, ওটা হচ্ছে একটা সম্বোধন। এটা একটা মিসটেক, গ্রেট মিসটেক। ভাবি, আরেকটা কথা বলি। আপনি সত্যি করে বলেন তো দেখি, এই বয়েসেও এ রকম একটা চিঠি পেয়ে আপনার একটুও ভালো লাগেনি? বলেন, ভালো লাগেনি?' মহিলার একটু কাছাকাছি আসি আমি।

মহিলা কিছু বলেন না, অদ্ভুত একটা দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে তাকান, পরম যত্নে চিঠিটা আবার ভাঁজ করে রেখে দেন তার ব্যাগে। তারপর আবার

আমাদের দিকে চেয়ে সেই রকম একটা চাহনি দিয়ে বের হয়ে যান ঘর থেকে।

কিছলু ভাইকে এবার আমার দরকার। খায়রুল আঙ্কেলের বাসা থেকে ঘুরে এসে আমাদের রুমে এসে দেখি ভয়াবহ খেপে আছেন কিছলু ভাই। বিছানার ওপর দু পা তুলে তিনি বসে আছেন, চুপচাপ। কোনো কারণে খেপে গেলে বিছানার ওপর এভাবে পা তুলে বসে থাকেন তিনি। কারো সঙ্গে তিনি তখন কোনো কথা বলেন না, কারো কথার কোনো জবাব দেন না, এমনকি বসে থাকতে থাকতে একবার চোখ বুজে ফেললে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চোখও খোলেন না।

যদিও কিছলু ভাই সচরাচর রাগেন না। অতি কঠিন কারণেও তাকে কখনো রাগতে দেখিনি আমরা। বছরে বেশি হলে মাত্র একবার তিনি এ রকম ভয়াবহ রেগে যান, তার কারণও থাকে ভয়াবহ।

বছর দেড়েক আগে তিনি এ রকম একবার রেগেছিলেন। সেদিন কিছলু ভাইয়ের কী একটা চাকরির ইন্টারভ্যু ছিল। তিনি গোসল-টোসল সেড়ে কাপড়-চোপড় পরে যেই না বাইরে বের হবেন, তখনই বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তার। চাপটা একটু বেশিই ছিল, তাই দ্রুত শার্ট-প্যান্ট খোলার পর জাঙ্গিয়া খুলতে গিয়েই তিনি টের পান জাঙ্গিয়াটা আটকে আছে শরীরের সঙ্গে, কিছুতেই সেটা খুলতে পারছেন না তিনি। এদিকে সবকিছু শরীর থেকে বের হয়ে যায় যায় অবস্থা। অনেক কষ্টে সেটা টেনে খুলে বাথরুমে গিয়ে ক্লিয়ার হয়ে এসে দেখেন, তার জাঙ্গিয়ার সামনে ভেতরের দিকে কে যেন চুইংগাম খেয়ে লাগিয়ে রেখেছে। মাথায় আগুন ধরে যায় কিছলু ভাইয়ের। আজ তার ইন্টারভ্যু, আর তার জাঙ্গিয়াও ওই একটাই।

বিকেলে ভার্সিটি থেকে ফিরে রুমে ঢুকেই দেখি কিছলু ভাই চুপচাপ বসে আছেন বিছানার ওপর, তার সামনে গম্ভীর মুখে বসে আছে পল্লব আর রবি।

'কী হয়েছে?' বলেই পল্লব আর রবির পাশে বসি আমি। কেউ কোনো জবাব দেয় না। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, 'কী হয়েছে?' এবারও কেউ জবাব দেয় না। আমি কিছলু ভাইয়ের একটা হাত ধরার চেষ্টা করতেই তিনি আমার হাতটা ছিটকে সরিয়ে দেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাতটা আবার ফিরিয়ে এনে কিছুটা জোর করে কিছলু ভাইয়ের ডান হাতের ওপর রেখে বলি, 'আপনি তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, আমাদের মুরব্বি, আর সেই আপনি যদি এভাবে রেগে থাকেন, তাহলে আমরা যাব কোথায়!'

প্রায় দুই ঘণ্টা পর কিছলু ভাই পাশ থেকে জাঙ্গিয়াটা তুলে মেলে ধরেন

আমাদের সামনে।

পল্লব একটু পিছিয়ে এসে বলে, 'কী হয়েছে এটার?'

কিছলু ভাই গম্ভীর হয়ে বলেন, 'ভেতরটা তাকিয়ে দেখো।'

একটু উঁকিঝুঁকি মেরে পল্লব কিছুটা নাক ঝুঁচকে বলল, 'ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি না তো।'

'হাতে নিয়ে দেখো।'

'হাতে নেব?'

পল্লব ভাই একটু রেগে বলেন, 'অসুবিধা কোথায়?'

'না—।' পল্লব খুক্ খুক্ করে একটু কেশে বলে, 'আসলে কে যেন বলেছিল, গোপন জিনিসগুলো সব সময় গোপনই রাখা উচিত, প্রকাশ্যে আনার দরকার কী?'

'গোপন জিনিস কেন গোপনে রাখা উচিত?' কিছলু ভাই কিছুটা চিবিয়ে চিবিয়ে পল্লবকে জিজ্ঞেস করেন।

'এ প্রশ্নের উত্তর তো একটা গাধাও দিতে পারবে।'

'সে জন্যই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।'

ফিক করে হেসে ফেলি আমি, সঙ্গে রবিও। পল্লব মাথা নিচু করে ফেলতেই আমি কিছলু ভাইকে বলি, 'ওটার ভেতর কী আছে?'

কিছলু ভাই কোনো কথা না বলে জাঙ্গিয়াটা উল্টিয়ে দেখান। আমি সেদিকে তাকাই না, কারণ আমি তো জানি সেখানে কী লেগে আছে। কাল রাতে চুইংগাম চিবোনোর পর সেটা ফেলে দেওয়ার সময় কোনো জায়গা না পেয়ে শেষে...। প্রসঙ্গটা পাল্টানোর জন্য দ্রুত আমি কিছলু ভাইকে বলি, 'আপনি ফুটো জাঙ্গিয়া পরেন নাকি?'

'কোথায় ফুটো দেখলে তুমি! মাত্র কদিন আগে এ জাঙ্গিয়াটা কিনেছি আমি।'

'অবশ্যই ফুটো আছে। ফুটো না থাকলে জাঙ্গিয়ার ভেতর পা ঢোকান কীভাবে?'

কিছলু ভাই হেসে ফেলেন। তারপর তিনি খুব কাতর গলায় আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'এবার সত্যি করে বলো তো দেখি, এ আকামটা কে করেছে?'

পল্লব বলে, 'আমি না।'

রবি বলে, 'আমি না।'

আমি বলি, 'আমিও না।'

কিছলু ভাই জানালা দিয়ে জাঙ্গিয়াটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, 'দূর শালা, এটা আর পরবই না!'

আজও রেগে বুম হয়ে আছেন কিছলু ভাই। তিন দিন গ্রামের বাড়ি কাটিয়ে কাল সন্ধ্যায় ফিরে এসেছেন তিনি। তখন তো তাকে দেখে ফুর্তিবাজই মনে হচ্ছিল, কিন্তু এরই মধ্যে ভয়াবহ কী হলো যে তিনি ভয়াবহ রেগে আছেন! আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারছি না, কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছি না। অথচ কিছলু ভাইকে এ মুহূর্তে আমার ভীষণ প্রয়োজন। হৃদয়ে ঝড় না, তুফান না, জোয়ার না, সুনামি তোলা একটা চিঠি লেখা প্রয়োজন। সুনামির পানি যেমন সবকিছু তছনছ করে দেয়, এ চিঠিটা যে পড়বে সেও তছনছ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কিছলু ভাই এত মানুষকে চিঠি লিখে দিয়ে উদ্ধার করেছেন, আজ আমাকে উদ্ধার করা দরকার। অথচ তিনি রেগে আছেন, ভয়াবহ রেগে আছেন।

মিনিট দশেক কিছলু ভাইয়ের পাশে বসে একবার হাতের আঙুল টেনে, জামার বোতাম ঠিক করে দিয়ে, এমনি এমনি ট্রাউজারের পায়ের কাছে টোকা দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে, শেষে বললাম, 'শ্রদ্ধেয় কিছলু ভাই, আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে, জীবন-মরণ জরুরি।'

মাথা তুলে তাকালেন কিছলু ভাই। গলাটা যতটা সম্ভব গম্ভীর করে বললেন, 'তার আগে তোমাদের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, সেটাও জরুরি কথা।'

দ্রুত কিছলু ভাইয়ের একটা হাত চেপে ধরে আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন হওয়ার ভান করে বললাম, 'বলুন বলুন।'

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ান কিছলু ভাই। তারপর টয়লেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'সন্ধ্যায় তোমরা সবাই রুমে থেকো, একটা মিটিং করব আমি, মিটিংয়েই সেই জরুরি কথাটা বলব।' কিছলু ভাই টয়লেটে ঢুকে ঠাস করে বন্ধ করে দেন দরজাটা।

ভার্সিটি থেকে ফিরে বাসার সামনে এসে আগে কোনো দিকে তাকাতাম না, এখন তাকাই। কোনো কোনো সময় বাসার সামনে একটু পায়চারিও করি। তারপর হঠাৎ এক ঝটকা চোখ দুটো তুলে ধরি তিনতলার জানালার কাছে, যেখানে খায়রুল আঙ্কেল থাকেন, খায়রুল আঙ্কেলের স্ত্রী আন্টি থাকেন, ছেলে রন্টু থাকে, ছোট মেয়ে লোপা থাকে, আর থাকে রুহিনা, রুহিনা তাসকিন, খায়রুল আঙ্কেলের বড় মেয়ে। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, জানালাটা বেশির ভাগ সময় বন্ধই থাকে।

রুম থেকেও আগে তেমন বের হতে ইচ্ছে করত না। ভার্সিটি থেকে ফিরে কিংবা নিচে কোনো কাজ সেরে আমাদের সাড়ে ছয়তলার রুমে ঢুকে আবার নিচে নেমে আবার ওপরে ওঠার শক্তি থাকত না। ইদানীং কোথা থেকে যেন শক্তিটা শরীরে এসে ভর করেছে। এখন কোনো অছিলা ছাড়াই রুম থেকে বের হয়ে নিচে নামি, একটু পর আবার উঠি। এই নামা এবং ওঠার সময় একটা জায়গায় এসে খুব স্মুথলি পা দুটো থেমে যায় আমার, একা একাই থেমে যায়, আর সেটা হলো—তিনতলায় খায়রুল আঙ্কেলের দরজার সামনে। কোনো কোনো সময় সেখানে দাঁড়িয়ে বাঁধা জুতোর ফিতা খুলে আবার বাঁধি, খুক্ করে এমনি এমনি একটু কাশি দিই, একটু দাঁড়িয়ে শার্টের বোতাম কিংবা কলার ঠিক করি, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে সবকিছু নিয়েছি কি না তা চেক করি, মাঝে মাঝে এমনি এমনি দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভাবিও। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, দরজাটা বেশির সময় বন্ধ থাকে এখানেও।

তবে এই ওঠানামার সময় সবচেয়ে অসুবিধাজনক হচ্ছে বদরুল চাচা, আমাদের বাড়িওয়ালা, আমরা যাকে আড়ালে বদ বলে ডাকি। তিনি দিনের মধ্যে কম করে হলেও তিন-চারবার এই ছয়তলার সিঁড়ি ভেঙে ছাদে আসেন, পানির পাইপ দেখেন, টবে কয়েকটা গাছ লাগিয়েছেন তাতে পানি দেন, কখনো

কখনো হাওয়া খেতেও এখানে আসেন। কিন্তু আমরা তো জানি, তিনি কেন এখানে আসেন।

একদিন খায়রুল আঙ্কেলের দরজার সামনে বসে এমনি এমনি জুতোর ফিতা ঠিক করছিলাম। বদ চাচা হঠাৎ দোতলা থেকে ওপরে উঠছিলেন। লোকটা হাঁটেও, শেয়ালের মতো নিঃশব্দে। আমাকে দেখেই কেমন যেন চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি নিজের জুতা নিজেই পলিশ কর নাকি?'

বদের কথাটা শুনেই রাগটা মাথায় উঠে আসে। কিন্তু তিনি তো বাড়িওয়ালা, রাগ প্রকাশ করা যাবে না। রাগটা আলতোভাবে থামিয়ে দিয়ে মুখে একটু হাসি টেনে আনি। তারপর ডান হাতটা একটু উঁচু করে সালাম দিয়ে বলি, 'জি, আমার নিজের জুতো আমি নিজেই পলিশ করি, আপনি কারটা করেন?'

রেগে যান বদ চাচা, 'আমি কারটা করি মানে?'

'না মানে, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না আমি নিজের জুতো নিজেই পলিশ করি কি না, আমি ভেবেছি আপনি অন্যের জুতাও পলিশ করেন।'

'তোমাদের মতো ছেলেরা একটুতেই খুব বেশি বোঝে।'

'না বুঝলে চলবে কী করে আঙ্কেল, আশপাশে কত বদ মানুষ বাস করে, তাদের বদামি থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে তো!'

'শোনো ছেলে, তোমার মধ্যে বাঁদরামির ভাবটা বেশি। তোমাকে দেখে মনে হয়, সত্যি সত্যি বানর থেকে মানুষ হয়েছে।'

'স্যরি আঙ্কেল, বানর থেকে কখনো মানুষ হয়নি।'

'তুমি কী করে বুঝলে?'

'কই, চিড়িয়াখানার একটা বানরও তো এখনো মানুষ হলো না।' আমি একটু থেমে বলি, 'তবে কারো কারো মুখে শুনেছি, মানুষের দেহে নাকি পশুর দুটো হাড় থাকে!'

'তাই নাকি!'

বদ আঙ্কেলের দিকে ভালো করে তাকাই আমি। তারপর তার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলি, 'শুধু পশুর হাড় না, কেউ কেউ বলে কারো কারো দেহে নাকি আস্ত একটা পশুই লুকিয়ে থাকে।'

ভাবলেশহীন বদরুল চাচা একবার আমার দিকে তাকান। তারপর মাথাটা একটু নিচু করে কী যেন ভাবেন। আর কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করেই তিনি ছাদের দিকে এগিয়ে যান।

ইদানীং আরো একটা অসুবিধা হচ্ছে, বদরুল চাচা বাসায় না থাকলে তার

তিন মেয়ে একসঙ্গে ছাদে এসে উপস্থিত হয়। এসেই চড়ুইপাখির মতো এমন কিচিরমিচির শুরু করে, আমরা বিরক্ত হয়ে আমাদের রুমের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিই। এই দরজা-জানালা বন্ধ রাখার আবার দুটো সুবিধা আছে। এক. ছাদে মেয়েদের উপস্থিতির সময় হঠাৎ যদি বদরুল চাচা এসে উপস্থিত হন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন, আমাদের দরজা-জানালা সব বন্ধ। দুই. আমাদের রুমের জানালায় বেশ কায়দামতো একটা ফুটো আছে, কিছলু ভাই বাদে আমরা তিনজন পালাক্রমে সেই ফুটোতে চোখ রেখে চড়ুইপাখি তিনটি দেখি, প্রাণভরে দেখি। আমাদের এ দু নয়ন তখনই সার্থক হয়, যখন চড়ুইগুলো গলা ছেড়ে একসঙ্গে বাংলা সিনেমার গান গাইতে থাকে আর খুব ভাব নিয়ে নাচার ভঙ্গিতে হাত-পাগুলো নাড়তে থাকে।

বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। বিকেল হয়ে গেছে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও বের হয়ে বাসার সামনে খেলছে। আমি খুব ভদ্র ছেলে মতো পায়চারি করছি আর সুযোগমতো তিনতলার জানালার দিকে তাকাচ্ছি। জানালাটা বন্ধ।

ভীষণ বিরক্ত লাগছে। সারা দিন দরজা-জানালা বন্ধ রাখলেও মানুষ তো বিকেলের দিকে হাওয়া-বাতাসের জন্য একটু খুলে দেয়। এরা দেখি সেটাও করে না! মনটা খারাপ খারাপ লাগছে। হঠাৎ চোখ দুটো আবার তিনতলায় তুলতেই দেখি, জানালাটা খোলা। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আর আলো নিয়ে সেই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুহিনা, রুহিনা তাসকিন। যার জন্য দাঁড়িয়ে আছি প্রায় দেড় ঘণ্টা হলো; এবং দেড় ঘণ্টা পর এই প্রথম টের পেলাম, কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে পা দুটো।

রুহিনা তাসকিন তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, আর আমি তাকিয়ে আছি তার দিকে। একটু একটু করে তাকে দেখছি, একটু একটু করে ভাবছি, একটু একটু করে অন্য জগতেও চলে যাচ্ছি। কিন্তু এরই মাঝে একটু একটু করে কখন যে খায়রুল আঙ্কেল আমার পেছনে এসে উপস্থিত হয়েছেন, টেরই পাইনি। তিনি যখন আমার পিঠে আলতো স্পর্শ করলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। মানুষ তার ঠিক সামনে জলজ্যান্ত একটা বাঘ দেখলে যতটা না চমকে উঠবে, তার চেয়েও অনেক বেশি চমকে উঠলাম আমি। আয়নায় না তাকিয়েও আমি টের পেলাম, সমস্ত মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আমার, ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটোতে আতঙ্ক এসে ভর করেছে। কিন্তু এর মাঝেও দম দেওয়া পুতুলের মতো আমার ডান হাতটা কাঁপা কাঁপাভাবে আপনা-আপনি

একটু উঁচু হলো, আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো, 'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

খায়রুল আঙ্কেল মুচকি হেসে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'এখানে কী করছ?'

'তেমন কিছু না। একটু হাঁটাহাঁটি করছি। সারা দিন লেখাপড়া করে ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না।'

'সামনে পরীক্ষা নাকি তোমার?'

'ঠিক পরীক্ষা না, পরীক্ষার বেশ দেরি আছে। আগে থেকেই পড়াগুলো কমপ্লিট করে রাখছি।'

'চলো।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার বাসায়!'

বুকের ভেতরটা বন্ধ হয়ে আসে আমার। এক ধরনের চাপ এসে কেমন যেন স্থির করে ফেলে আমাকে, আমার সবকিছুকে। আমি স্পষ্ট টের পাই, আমার শরীরের রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রক্তগুলো থমকে দাঁড়িয়েছে। খায়রুল আঙ্কেল কয়েক পা এগিয়ে গেছেন, আমি দ্রুত তার পেছন পেছন এগোতে থাকি।

তিনতলার সামনে এসে খায়রুল আঙ্কেল কলবেল চাপেন। কলবেলে শব্দ হয়, আমি টের পাই আমার বুকের ভেতর তার চেয়ে বেশি শব্দ হচ্ছে।

দরজা খুলে যায়। আমি যাকে ভেবেছিলাম, সে না, রন্টু দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। খায়রুল আঙ্কেলের একমাত্র ছেলে, আর ভবিষ্যতে আমার একমাত্র শ্যালক—এটুকু ভাবার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল করে দেয় রন্টু। সে আমার দিকে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বেশ কিছুটা অভিমানী স্বরে বলে, 'আঙ্কেল, এত দিন কোথায় ছিলেন আপনি? আপনার সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে আমার।'

রন্টু আমাকে আঙ্কেল ডাকছে, তার মানে ও আমার ভাতিজা! ভাতিজা কখনো শ্যালক হতে পারে কি না, এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু সে আলোচনার আগেই রন্টুকে পাশে ডেকে নিয়ে একটু আড়ালে যাই আমি। খায়রুল আঙ্কেল ভেতরের রুমে চলে গেছেন। আমি রন্টুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলি, 'তোমার সঙ্গেও জরুরি একটা কথা আছে আমার।'

বেশ আগ্রহ নিয়ে রন্টু আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'বলুন না, এখনই বলুন।'

'বলব?'

'হ্যাঁ বলুন।'

রন্টুর মুখোমুখি দাঁড়াই আমি। ভালো করে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, 'আচ্ছা রন্টু, আমার দিকে ভালো করে একটু তাকাও তো দেখি?'

কিছু বুঝতে পারে না রন্টু। আমি ওকে আবার বলি, 'তুমি ভালো করে আমার মুখের দিকে তাকাও।'

মনোযোগ দিয়ে রন্টু আমার দিকে তাকায়। জিজ্ঞাসু একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কিন্তু ও কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, 'আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়?'

এবারও কিছু বুঝতে পারে না রন্টু। আমি রন্টুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলি, 'আমার চেহারার ভেতর আঙ্কেল ভাবটা বেশি, না ভাইয়ের ভাবটা বেশি?'

না বুঝতে পারা দৃষ্টি নিয়ে রন্টু বলে, 'বুঝতে পারলাম না।'

'না—।' আমি রন্টুর আরো একটু কাছ ঘেঁষে বলি, 'আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়—আমাকে তোমার আঙ্কেল ডাকা উচিত, না ভাই ডাকা উচিত?'

'আপনাকে আমি তো ভাই-ই ডাকতে চাই। কিন্তু প্রবলেম তো করে ফেলেছেন আপনি।'

'আমি আর কোথায় প্রবলেম করলাম।'

'আপনি না আব্বুকে ভাই ডাকেন, আম্মুকে ভাবি। আব্বুর ভাইকে তো আঙ্কেলই ডাকা উচিত, না-কি?'

'তা-ই তো ডাকা উচিত। কিন্তু শুনে তুমি খুশি হবে, তোমার আব্বুকে আমি এখন আঙ্কেল ডাকি।'

'আব্বুকে হঠাৎ আঙ্কেল ডাকেন কেন?'

\ পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে আমার। রন্টুকে এখন কী দিয়ে বোঝাই। খায়রুল আঙ্কেলকে যা বুঝেয়েছি, ওকে কি তা বোঝানো ঠিক হবে? আমি দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য রন্টুর দিকে একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলি, 'আমার মনে হয় ইদানীং একটা বিষয় নিয়ে তুমি খুব চিন্তায় আছ, মারাত্মক চিন্তায় আছ।'

রন্টু খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আপনি বুঝলেন কী করে?'

আমি কিছু বলি না, রহস্যময় একটা হাসি দিই রন্টুর দিকে তাকিয়ে। রন্টু

বিভ্রান্ত হয়। ও আমার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে বলে, 'বলেন না আঙ্কেল, ঝুঝলেন কী করে?'

রহস্যময় হাসিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে রন্টুকে বলি, 'উঁহু, আগে তোমার সম্বোধন ঠিক করো। আমি যেহেতু তোমার আব্বুকে এখন ভাইয়ের বদলে আঙ্কেল ডাকি, তোমারও উচিত আমাকে আঙ্কেলের বদলে ভাই ডাকা।'

রন্টু একটু ইতস্তত করে বলে, 'জি, ভাই, অর্ণক ভাই।'

পাশের ঘর থেকে আন্টি হাসতে হাসতে এ ঘরে ঢোকেন। হাতে একটা প্লেট, তার মধ্যে কিছু চানাচুর, পাশে এক টুকরো আপেল। আমার দৃষ্টিটা সে আপেলের টুকরোকে পাশ কাটিয়ে পেছনে চলে যায়। আরেকজন ঘরে ঢুকেছে, তার হাতে একটা কাপ আর পিরিচ। স্বচ্ছ কাচের সে কাপ ভেদ করে আমি দেখতে পাচ্ছি, কাপে পানীয় জাতের কিছু আছে, নিঃসংকোচে বলা যায় চা আছে।

সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে আসে আমার। আমি কেমন যেন থেমে যাই। আমার সামনে আমার জন্যই চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুহিনা তাসকিন, যার জন্য আমি প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকি বাসা কিংবা ঘরের দরজার সামনে। রুহিনা তাসকিন চায়ের কাপটা টেবিলে রাখল, আন্টিও তার হাতের প্লেটটা টেবিলে রাখলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কী ব্যাপার অর্ণক, তুমি নাকি এখন থেকে আমাকে আন্টি বলে ডাকবে?'

লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলি আমি। আন্টি হাসতে হাসতে আরো একটু কাছে এসে বলেন, 'লজ্জা পেতে হবে না, তুমি আমাকে আন্টি বলেই ডেকো। আর হ্যাঁ, এই ছেলে, মাথা নিচু করে আছ কেন, তাকাও আমার দিকে! কদিন আগেও বাসায় এসে হইচই করত, আর এখন পাচ্ছে শরম। রন্টুর মাথাটা তো খেয়েছ, একটা কিছু হলেই অর্ণক আঙ্কেল অর্ণক আঙ্কেল বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলে।'

পাশ থেকে রন্টু কিছুটা উৎসাহী হয়ে বলে, 'এখন আঙ্কেল না, ভাই, অর্ণক ভাই।'

আন্টি আমার দিকে আরো একটু এগিয়ে এসে বলেন, 'এ হচ্ছে আমার বড় মেয়ে, বরিশাল মেডিকেলে পড়ে।'

অভ্যাসটা বেশ ভালোই রপ্ত হয়েছে আমার। ডান হাতটা আপনা-আপনি একটু উঁচু হয়ে আসে, বুকের কাছে এসেই সেটা থেমে যায়, মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

'আর এ হচ্ছে— ।' আন্টি তার বড় মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'অর্ণক, এ বিল্ডিংয়ের ছাদে থাকে।'

'ঠিক ছাদে না— ।' আন্টির কথাটাতে সংশোধনী এনে বলি, 'ছাদে যে ফ্ল্যাটটা আছে সেখানে থাকি।'

'ওই হলো।' আন্টি রন্টুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আয় তো, একটু দোকানে যেতে হবে। তোর বাবাকে একটা জিনিস আনতে বলেছিলাম, আনতে ভুলে গেছে।' আন্টি এবার আমার দিকে তাকান, 'তোমরা গল্প করো, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

রুহিনা তাসকিন দরজার দিকে তাকাল। তার মা চলে গেছে ভাইকে নিয়ে, এটুকু নিশ্চিত হয়েই সে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। তারপর অবজ্ঞার চাহনি আর কটাক্ষ স্বরে বলল, 'ভালোই তো সবকিছু ম্যানেজ করে ফেললেন!'

'মানে!' রুহিনার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকালাম আমি।

'এই যে, ভাই থেকে আঙ্কেল, ভাবি থেকে আন্টি।'

'ও, সম্বোধনের কথা বলছেন?' আমি রুহিনার দিকে তাকিয়ে বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলি, 'পৃথিবীতে প্রতিদিন কত কিছুই তো পাল্টে যায়, এ তো সামান্য সম্বোধন।'

'তা হঠাৎ এ সম্বোধন পাল্টে যাওয়ার কারণ?'

'আপনার কি মনে হয় কোনো কারণ আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

রুহিনার দিকে আমি আবার হাসি হাসি মুখ করে তাকাই, 'আপনার যেহেতু মনে হচ্ছে সম্বোধন পাল্টে যাওয়ার কোনো কারণ আছে, আপনি তাহলে এটাও বুঝতে পারছেন কারণটা কী?'

কিছু বলে না রুহিনা। শুধু আলতো একটা চাহনি দিয়ে চোখ দুটো ফিরিয়ে নেয় আবার। দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে থাকি আমি। চা ঠান্ডা হয়ে যায়, চানাচুর নরম হয়ে যায়, সাদা আপেল হয়ে যায় কালচে, আমি তবু দুলতেই থাকি। হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে—টিক টিক টিক। কসম, জীবনে অনেক টিকটিকির ডাক শুনেছি, কিন্তু এত মনোযোগ দিয়ে কখনো শুনিনি!

কিছলু ভাই গম্ভীর হয়ে বসে আছেন বিছানায়। পা দুটো আড়াআড়ি করে কেঁচকি মেরে তিনি এমনভাবে বসে আছেন, যেন তিনি একটা পাথরের ভাস্কর্য, স্থির।

পল্লব আর রবি বসে আছে পাশে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই কিছলু ভাই কিছুটা রাগি গলায় বললেন, 'এত দেরি করলে যে?'

'দেরি করলাম মানে?'

'তোমাকে না বলেছিলাম সন্ধ্যায় রুমে থেকো, জরুরি একটা কথা আছে আমার?'

'এখন তো সন্ধ্যাই।'

'অর্ণক—।' কিছলু ভাই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বেশি আজেবাজে কথা বলবে না। কোন সময়কে সন্ধ্যা বলে আর কোন সময়কে রাত বলে, সেটা তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে না। আর একটা কথা—মানুষকে মূল্যায়ন করতে শেখো, তাহলে নিজে মূল্য পাবে।'

'স্যরি কিছলু ভাই, মাফ করে দেন আমাকে। বাইরে একটু কাজ ছিল তো, তাই দেরি হয়ে গেল।'

'সেটা আগে বললেই পারতে।'

কিছলু ভাই একটু সোজা হয়ে বসে বলেন, 'পল্লব, যাও তো, ছাদের গেটটা বন্ধ করে দিয়ে আসো।'

পল্লব একটু মোচড় দিয়ে উঠে বলল, 'বন্ধ করে দিয়ে আসব?'

'ওই মিয়া, তুমি কি কানে কম শোনো নাকি?'

'না মানে, বাড়িওয়ালা যদি ছাদে আসে?'

'ছাদে আসলে দরজা খুলে দেব।'

'উনি তো এ দরজাটা বন্ধ করতে নিষেধ করেছেন।'

'ওনার সব নিষেধ শুনতে হবে নাকি! যাও, বন্ধ করে আসো। আর শোনো, আসার সময় এক বোতল ঠান্ডা পানি নিয়ে এসো।'

পল্লব ঘরের বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছলু ভাইয়ের মোবাইলটা বেজে উঠে। উনি কিছুটা চমকে উঠে মোবাইলের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে হাতটা বাড়িয়ে পাশ থেকে মোবাইলটা নিয়ে কানের সঙ্গে চেপে ধরে খুব মিহি গলায় বলেন, 'হ্যালো। কে, বাবা? জি বাবা, মোবাইল এতক্ষণ বন্ধ ছিল। আপনার বিষয়টা কালকেই জানিয়ে দেব আমি। আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না। কাল সকালেই, না না বিকেলে রিপোর্টটা পাব, তারপর আমি আপনাকে জানাব। না না, আপনাকে ফোন করতে হবে না, আমিই ফোন করব আপনাকে। আচ্ছা রাখি, আস্সালামু আলাইকুম।'

মোবাইলটা রেখে কেমন যেন হাঁপাতে থাকেন কিছলু ভাই। সারা মুখে বেশ রাগও ফুটে ওঠে। আমি একটু ঝুঁকে বসে বলি, 'কিছলু ভাই, কোনো প্রবলেম?'

কোনো কথা না বলে কিছলু ভাই পাশ থেকে মোবাইলটা আবার হাতে তুলে নেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে ওঠে মোবাইলটা। মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মুখটা কুঁচকে ফেলেন তিনি। বেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনটা রিসিভ করেন। তারপর ঝাড়া পনেরো সেকেন্ডের মতো সেটা কানের সঙ্গে ধরে রাখেন। বোঝা যাচ্ছে ওপাশ থেকে কেউ কথা বলছে, তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তবে কিছলু ভাইয়ের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, তিনি শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না, ভয়মিশ্রিত অতি ভক্তি নিয়েও শুনছেন। শেষে তিনি বেশ চিকন গলায় বলেন, 'বাবা, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। সময় চলে যাচ্ছে ঠিক, আমি কালকেই, মানে বিকেলের মধ্যেই আপনাকে রিপোর্টটা জানাচ্ছি। না না, আপনাকে আর ফোন করতে হবে না, আমি রিপোর্ট হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দেব। জি জি কাল বিকেলের মধ্যেই। আস্‌সালামু আলাইকুম।'

কানের কাছ থেকে মোবাইলটা সরিয়ে আবার হাঁপাতে থাকেন কিছলু ভাই। এবার বেশ জোরেশোরেই বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে দেন মোবাইলটা। পল্লব পানির বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। কিছলু ভাই হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে সবটুকু পানি খেয়ে ফেলে বললেন, 'যাও, আরো এক বোতল পানি নিয়ে আসো।' পল্লব পানি আনার জন্য বোতলটা হাতে নিতেই কিছলু ভাই বললেন, 'পল্লব, তুমি বসো। এবার রবি যাও তো।'

পল্লব সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না না আমিই যাই।'

'না, তুমি বসো।'

'আমি গেলে অসুবিধা কী?'

'ওই মিয়া, তুমি বেশি প্যাচাল পার। রবিকে যেতে বলেছি রবি যাক।' কিছলু ভাই রবির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'রবি যাও।'

পল্লবের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে রবি বাইরে যেতেই কিছলু ভাইয়ের মোবাইলটা আবার বেজে ওঠে। কিন্তু কিছলু ভাই সেদিকে তাকানই না। মোবাইল বাজতেই থাকে। পল্লব খুক্ করে কেশে উঠে বলে, 'কিছলু ভাই, আপনার ফোন বাজছে।'

'বাজুক।'

'ধরেন।'

'না, ধরতে ইচ্ছে করছে না।'

'ধরতে ইচ্ছে না করলে কেটে দেন।'

'ওই মিয়া, ফোন ধরব না কেটে দেব, সেটা তোমার কাছ থেকে শুনে করতে হবে নাকি!'

'কানের কাছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হচ্ছে, বিরক্ত লাগছে। মাশাল্লাহ আপনার রিং টোনও! এর চেয়ে চকবাজার রোডের ভুটভুটির আওয়াজও অনেক ভালো।'

রবি পানি নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। কিছলু ভাই পানির বোতলটা আবার হাতে নিলেন। কিন্তু মুখে তুলতে নিয়েই থেমে গেলেন। রবির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'ছাদের গেটটা দেখেছ?'

মাথা নিচু করে ফেলে রবি, কিছু বলে না।

'কথা বলছ না কেন রবি?' কিছলু ভাই একটু শব্দ করে বলেন।

'জি, দেখেছি।' রবি মাথা নিচু করেই বলে।

'দরজাটা খোলা, না?'

'জি।'

কিছলু ভাই ভয়াবহ চাহনি দিয়ে পল্লবের দিকে তাকান। কিন্তু পল্লব সে চাহনিকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'স্যরি, ভুলে গিয়েছি কিছলু ভাই।'

'পল্লব, আমি খেয়াল করেছি তুমি ইদানীং আমাকে পাত্তাই দিতে চাও না। আমি তোমাকে বললাম, ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দিতে, আর তুমি সেটা না করেই চলে এলে। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেই রবিকে পাঠিয়েছিলাম। আচ্ছা, তুমি এমন কেন বলো তো? আমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছি, তুমি ইদানীং অনেক আজেবাজে কাজও কর।'

'আজেবাজে কাজ মানে!' পল্লব অবাক হয়ে বলে।

'আমাকে আর মুখ খুলিয়ো না। যখন বিপদে পড়ো তখন আমাকে ভাই ভাই করে মুখে ফেনা তুলে ফেলো, বিপদ কেটে গেলেই ভাই থেকে আমি হয়ে যাই ভোদাই।'

কিছলু ভাইয়ের একটা হাত চেপে ধরে আমি বলি, 'এখন এসব থাক না কিছলু ভাই।'

'থাকবে কেন, তোমার মনে আছে ওই ব্যাপারটা?'

ব্যাপারটা আমার মনে আছে, তবু আমি বেশ আগ্রহ দেখানোর ভাব করে

বললাম, 'কোন ব্যাপারটা?'

'ওই যে, পাশের বাসার ভদ্রলোক যে কাণ্ডটা ঘটাল?' কিছলু ভাই আমার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকান।

মাস চারেক আগে একদিন বিকেলে কিছলু ভাই হনহন করে ঘরে ঢুকে বললেন, 'পল্লব কোথায়?' পল্লব ঘুমিয়ে ছিল। কিছলু ভাই ওকে জোর করে টেনে তুলে বললেন, 'এখনই বাথরুমে যাও, গিয়ে দ্রুত দাড়িটা কেটে আসো।' পল্লব কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিল, কিন্তু কিছলু ভাই ওকে জোর করে বাথরুমে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, 'যা বলছি তাড়াতাড়ি করো।'

সাধ করে বেশ বড় বড় দাড়ি রেখেছিল পল্লব, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তা পরিষ্কার করে বাইরে আসে ও। সঙ্গে সঙ্গে কিছলু ভাই ওর মুখটা নেড়েচেড়ে দেখে গম্ভীর হয়ে বলেন, 'পল্লব, তোমার কপালের ওপরের চুলগুলো একটু কাটতে হবে।' বলেই তিনি হাতে প্রস্তুত রাখা কাঁচি দিয়ে কচ কচ করে পল্লবের সামনের চুলগুলো কেটে ফেলেন। পল্লব একটু বাধা দিতে চায়, কিছলু ভাই সে বাধাকে তোয়াক্কা না করে কানের দুপাশেরও কিছু চুল কেটে ফেলেন দ্রুত।

আয়নার দিকে তাকিয়ে রাগে-দুঃখে পল্লব বলল, 'এটা কী হলো?' কিছলু ভাই প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বলেন, 'এটা কী হলো তা একটু পরেই বুঝবে।' বলতে না বলতেই ছাদের গেট দিয়ে পাশের বাসার মালিক ঢোকেন ছাদে। কিছলু ভাই আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে এসে হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'দেখেন তো আঙ্কেল, এদের মধ্যে কেউ কি না?' ভদ্রলোক আমার, রবির আর পল্লবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না না, ওই ছেলেটার বেশ বড় বড় দাড়ি ছিল, চুলগুলোও বড় বড় ছিল বেশ।' কিছলু ভাইয়ের হাত-কচলানি শুরু হয়ে গেছে। তিনি বেশ মসৃণভাবে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'তাহলে অন্য বাসার কেউ হবে। এ ছাদে তো সব বাসার লোকজনই আসে।' ভদ্রলোক কপাল কুঁচকিয়ে বললেন, এ বাসার সবাইকেই তো আমি প্রায় চিনি।' কিছলু ভাই আগের মতোই হাত কচলিয়ে বলেন, 'জি। তবে গেস্ট-টেস্টও হতে পারে। ভদ্রলোক আমাদের দিকে ভালো করে আরেকবার তাকিয়ে বললেন, 'কত বড় সাহস, আমার মেয়েকে অঙ্গভঙ্গি করে ইশারা করে, সেটা আবার আমি দেখে ফেলি! সকালেই আমি ব্যাপারটা ফয়সালা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যবসার কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তা করতে পারিনি। যাকগে, তোমাদের কেউ এটা করোনি বলে ভালো লাগছে। তবে একটু খেয়াল রেখো। হারামজাদাকে পেলে হয়, জুতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমি।'

ভদ্রলোক গজরাতে গজরাতে চলে যান, আর আমরা অবাক চোখে ফিরে তাকাই পল্লবের দিকে। পল্লবও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কিছলু ভাই ওর দিকে একটু এগিয়ে এসে হাত দিয়ে পল্লবের পিঠ বোলাতে থাকেন, যেন সত্যি সত্যি ওর পিঠে জুতো দিয়ে কেউ পিটিয়েছে। কিছুক্ষণ এভাবে বোলানোর পর তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে বলেন, 'এখন বুঝতে পারছ, এটা কী হলো? তোমাদের না বলেছিলাম আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়েদের দিকে তো নয়ই, আশপাশের কোনো বাড়ির দিকে তাকানো যাবে না? আজ কী বিপদই না হতো! আবার বাসা ছাড়া, বাসা খুঁজে বের করা, ব্যাচেলর-সংক্রান্ত ঝামেলা, তোমাদের নিয়ে আর পারি না।' কিছলু ভাই পল্লবের আরো একটু কাছ ঘেঁষে বলেন, 'আজকের দিনটার কথা মনে রেখো।'

রবি আর আমি সেই দিনটার কথা হয়তো ভুলে যাই, তবে আমি একশ পার্সেন্ট নিশ্চিত পল্লব কখনো ভোলে না। চুরি করে ধরা পড়লে মানুষের চুল কেটে দেয়, আর পল্লবের কিনা সামান্য ইশারার করার ফলে চুল কাটতে হয়েছিল!

আমি কিছলু ভাইয়ের একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'বাদ দেন, আপনি কী যেন একটা জরুরি কথা বলবেন?'

কিছলু ভাই একটু নড়েচড়ে বসে বলেন, 'তার আগে কেউ গিয়ে ছাদের গেটের দরজাটা বন্ধ করে আসো।'

এবার আমি গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। কিছলু ভাই পা দুটো ছড়িয়ে বেশ আয়েশ করে বসলেন। তারপর একটু সময় নিয়ে, আমাদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে, স্বল্পমাত্রার একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এ বাসায় আসার পর থেকেই আমি টের পাচ্ছি, কে যেন গভীর রাতে চুপি চুপি আমার ঘরে ঢোকে।'

রবি আর পল্লব একসঙ্গে শব্দ করে বলে ওঠে, 'হায় হায়, এটা কী বললেন আপনি?'

আমি কিছু বলি না, মুচকি হাসি। একটু পর মুচকি হাসতে হাসতেই বলি, 'তা কোনো দামি কিছু চুরি হয়েছে আপনার?'

'ঠিক দামি কিছু না।' কিছলু ভাই একটু থেমে বলেন, 'তোমরা হয়তো জানো না, আমার শারীরিক একটা দুর্বলতা আছে।' কিছলু ভাইয়ের চেহারাটা শরমে ভরে যায়।

'ও, যার জন্য আপনি বিয়ে করতে চাইছেন না?' আমি আগের মতোই

মুচকি হেসে বলি। সঙ্গে সঙ্গে রবি আর পল্লব বিরক্ত হয়ে বলে, 'অর্ণক, তুই বেশি কথা বলিস, কিছলু ভাইকে বলতে দে।'

কিছলু ভাই আমার দিকে বিরক্ত-চোখে তাকিয়ে বলেন, 'তো সেই দুর্বলতা কাটানোর জন্য আমি কবিরাজি একটা সিরাপ খাই।'

'ওই যে কালো ছোট বোতলটায় যে সিরাপ থাকে?' পল্লব বেশ উৎসাহ নিয়ে বলে।

কিছলু ভাই সঙ্গে সঙ্গে পল্লবের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি জানলে কী করে?'

'বা রে, বোতলটা তো আপনি আপনার খাটের পাশেই রাখেন।'

'তো প্রতিদিন কেউ একজন আমার রুমে ঢুকে সেই বোতল থেকে বেশ কিছু সিরাপ খেয়ে যায়।' কিছলু ভাই বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রবি আর পল্লব একসঙ্গে বলে ওঠে, 'হায় হায়, এটা কী বললেন আপনি!'

আমি কিছু বলি না, মুচকি হাসি।

'আমার মনে হয়, তোমাদের মধ্যেই কেউ একজন আমার ঘরে ঢোকে এবং এ কাজটা করে যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে রবি আর পল্লব একসঙ্গে বলে ওঠে, 'হায় হায়, এটা কী বললেন আপনি!'

আমি কিছু বলি না, মুচকি হাসি।

'এমনকি গত রাতেও সে আমার ঘরে ঢুকেছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে রবি আর পল্লব একসঙ্গে বলে ওঠে, 'হায় হায়, এটা কী বললেন আপনি!'

আমি কিছু বলি না, মুচকি হাসি।

'এবং যথারীতি আমার সিরাপের বোতলের সবটুকুই সাবাড় করে দিয়েছে সে।'

সঙ্গে সঙ্গে রবি আর পল্লব একসঙ্গে বলে ওঠে, 'হায় হায়, এটা কী বললেন আপনি!'

আমি কিছু বলি না, মুচকি হাসি।

কিছলু ভাই এবার একটু হাসি হাসি মুখে বলেন, 'ব্যাপারটা একদিক দিয়ে যদিও আমার জন্য দুঃখজনক, তবে একটা মজার ব্যাপারও আছে। বোতলটাতে কোনো সিরাপ ছিল না। বাবার একটা অসুখের ব্যাপারে প্রস্রাব পরীক্ষা করার

দরকার ছিল। দুদিন আগে বাড়ি থেকে ফেরার সময় সেই প্রস্রাব নিয়ে এসেছিলাম ঢাকার কোনো ভালো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করার জন্য।

এবার রবি আর পল্লব কিছু বলে না। মুচকি হাসতে থাকে তারা। আমি কিছুটা চিৎকার করে উঠি, 'হায় হায়, এটা কী বললেন আপনি!'

কিছলু ভাই আমার কথার কোনো জবাব দেন না, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমিও তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আমার গলা দিয়ে সশব্দে একটা ঢেকুর বের হয়ে আসে। আমি স্পষ্ট টের পাই, সেই ঢেকুরে অন্য কোনো গন্ধ নেই, কেবল প্রস্রাবের গন্ধ, অবিকল প্রস্রাবের গন্ধ!

ভূত দেখলে মানুষ এত চমকে ওঠে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। তবে ভূত দেখে না, বাড়িওয়ালার মেজো মেয়েকে দেখে।

ঘুম থেকে একটু দেরিতেই উঠি আমি। উঠেই আমার প্রথম কাজ হলো ছাদে কয়েকবার পায়চারি করা। আজও ঘুম থেকে দেরিতে উঠেছি। তারপর যথারীতি ছাদে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছি। আমাদের ঘরের দরজার সামনে যে সামান্য উঁচু সিমেন্টের বেদি আছে, সেখানে উদাস হয়ে বসে আছে বাড়িওয়ালার মেজো মেয়ে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘুমায় কে জানেন?'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম আমিও। না, ওদিকে কেউ নেই। বুঝতে পারলাম কথাটা তাহলে আমাকেই বলা হয়েছে। অবাক হলে অনেকের বড় হয়ে যায় চোখ, আমার বড় হয়ে গেল মুখ। হাঁ করে তাকালাম আমি মেয়েটার দিকে। যে মেয়ের দিকে তাকানোই নিষিদ্ধ, সেই মেয়েটাই কিনা কথা বলছে আমার সঙ্গে! আমি কিছুটা দ্বিধা নিয়ে তাকে বললাম, 'আমাকে বলছেন?'

'এখানে আপনি ছাড়া অন্য আর কোনো প্রাণী দেখছি না তো!'

'আছে, আরো বেশ কয়েকটা প্রাণী আছে।'

মেয়েটা ঝট করে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'কই?'

'ওই যে আপনাদের পানির ট্যাঙ্কের ওপর একটা কাক বসে আছে, ছাদের বাঁ কোনায় একটা বিড়াল আয়েশ করে ঘুমিয়ে আছে, এক জোড়া চড়ুই কিচিরমিচির করছে ছাদের কার্নিশে, সম্ভবত সে কার্নিশে তাদের বাসায় দুটো বাচ্চাও আছে।'

সরু চোখে মেয়েটা এবার আমার দিকে তাকাল, 'ওদের সঙ্গে কেউ কথা বলে?'

'জি, বলে।'

'বলে!' মেয়েটা একটু শব্দ করে বলে, 'কারা বলে?'

'পাগলেরা বলে?'

'আপনি আমাকে পাগল বলছেন?'

'আপনি কি ওদের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'ওদের সঙ্গে আমি কথা বলতে যাব কেন!'

'তাহলে নিজেকে পাগল ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি তো বলেছি কেবল পাগলেরাই ওদের সঙ্গে কথা বলে, আপনি তো আর বলেননি।'

'আপনি এ রকম পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলেন নাকি!'

'কই, কথা পেঁচালাম কোথায়? কথা আবার পেঁচানো যায় নাকি? আমি তো জানি কেবল জিলাপিই পেঁচানো যায়।'

'আপনাকে ভেবেছিলাম অন্য রকম একজন, এখন দেখছি পুরোপুরি একজন খবিশ শ্রেণীর আপনি!'

'মানুষকে দূর থেকে অন্য রকমই মনে হয়, কাছে এলেই আরেক রকম হয়ে যায়। এই যেমন এখানে আসার আগে আপনাকে আমার এক রকম মনে হতো, এখন আরেক রকম মনে হচ্ছে।'

'এখন আরেক রকম মনে হচ্ছে মানে, কী রকম মনে হচ্ছে?'

'তা তো বলা যাবে না।'

'কেন বলা যাবে না?' মেয়েটা বেশ শব্দ করে বলে।

মেয়েটার দিকে আমি এবার হাসি হাসি মুখ করে তাকাই, তারপর গলার স্বর যতটা সম্ভব মধুর করে বলি, 'দেখুন, ইরাকে এখন যুদ্ধ হচ্ছে, আফগানিস্তানে ফাটছে বোমা, বার্মায় সামরিক জান্তা পেষণ করছে গণতন্ত্রকামী মানুষদের, পাকিস্তানে চলছে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারার খেলা, বিশ্বের কোথাও এ মুহূর্তে কেউ একজন খুন হচ্ছে, কেউ খুন করার জন্য নতুন কোনো অস্ত্র বানাচ্ছে, আর আমরা কিনা সে মুহূর্তেই করছি ঝগড়া! প্রথম পরিচয়েই এ রকম যুদ্ধংদেহী মনোভাব কি ভালো?'

'ঝগড়া তো আমি করছি না।'

'আমি করছি?'

'নয় তো কী?'

'তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হইব না কেন—আমি ঝগড়া করছি, আপনি তা থামাচ্ছেন না কেন?'

মেয়েটা কিছু বলে না, মাথাটা একটুক্ষণের জন্য নিচু করে আবার উঁচুতে

তুলে বলে, 'আপনি এত বেলা করে ঘুমান কেন?'

'রাতে অনেক কাজ করতে হয় তো।'

'রাতে তো কাজ করে অন্যরা।'

'জি, চোরেরা।'

হেসে ফেলে মেয়েটা। হাসলে সবাইকে ভালো লাগে, এমনকি অতি কুৎসিত কোনো মানুষকেও ভালো লাগে। এ মেয়েটা অতি কুৎসিতও না, অতি সুন্দরও না। আমি মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললাম, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'শিমু।'

'কী দিয়ে লেখা হয়—দন্ত্য স, না তালব্য শ দিয়ে?'

'তালব্য শ দিয়ে।'

'আমার নাম অর্ণক।'

'অর্ণক? কী দিয়ে লেখা হয়—দন্ত্য ন, না মূর্ধন্য ণ দিয়ে?' শিমু হাসতে হাসতে বলে।

'অর্ণক, অর্ণব-এ ধরনের নাম সাধারণত মূর্ধন্য ণ দিয়েই লেখা হয়।'

'লেখাপড়া?'

'পড়ি একটা কিছুতে। তবে এটা নিশ্চিত, যে সাবজেক্টে পড়ি চাকরিজীবনে সে সাবজেক্টের ধারেকাছে দিয়ে যাওয়া হবে না।'

'কেন?'

'আমাদের দেশে কতজন মানুষ তার নিজস্ব সাবজেক্টে চাকরি পেয়েছে বলেন? আমার এক মামা আছেন, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছেন, কিন্তু এখন চাকরি করেন ব্যাংকে। আচ্ছা, আপনি যে এতক্ষণ ধরে ছাদে আছেন, আপনার বাবা— ।'

হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে শিমু বলে, 'বাবা বাজার করতে গেছেন, ফিরতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা লাগবে। আর আপনার তিন সহচরকে দেখলাম বেরিয়ে যেতে।'

'তাই চলে এলেন।'

'হ্যাঁ, নিশ্চিন্তে চলে এলাম।' শিমু হাসতে থাকে।

'নিশ্চিন্তে!'

'ভয় পাওয়ার কিছু আছে নাকি?'

'তা নেই। আপনার আর দু বোন?'

'ওরা কলেজে গেছে।'

'আপনি?'

'আজ যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন?'

'তা তো জানি না।' শিমু অন্যদিকে তাকিয়ে বলে। এ মুহূর্তে শিমুর চোখ আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত চোখ দুটো ছলছল করছে তার। এ বয়সী মেয়েদের কারণে-অকারণে চোখ ছলছল করে ওঠে।

লোপা দপ দপ করে দৌড়ে এসে আমার ঘরে ঢুকে বলল, 'অর্ণক ভাইয়া, আম্মু আপনাকে ডাকে।'

কিছুটা অবাক হয়ে যাই আমি। লোপা এই প্রথম আমার ঘরে এলো। ওরা এ বাসায় আসার পর শুধু রন্টু আসত, আর কেউ না। আসার কথাও না। রন্টু আসত তার প্রয়োজনে, জটিল জটিল সব প্রয়োজনে। আমি প্রথম থেকেই খেয়াল করছি, ও আমাকে পীরের মতো ভক্তি করে। আমি যদি ওকে বলি, রন্টু, যাও তো ট্রাকের তলায় মাথা দিয়ে আসো, আমার ধারণা, ও সঙ্গে সঙ্গে তা-ই দেবে।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমি লোপার একটা কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, 'কেন?'

'রন্টু ভাইয়া যেন কেমন করছে।'

'কেমন করছে মানে?'

'তা বলতে পারব না। আপনি তাড়াতাড়ি চলেন।'

লোপাকে বললাম, 'তুমি যাও, আমি আসছি।'

'এখনই আসতে হবে আপনাকে।'

'হ্যাঁ, আমি এখনই আসছি।'

লোপা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে রইলাম একা একা। আমি জানি রন্টু এখন কী করছে। একেবারে খারাপ কিছু করছে না ও। এর জন্য একটু দেরি করে গেলে তেমন কিছু আসবে-যাবে না। আমি গিয়ে শুধু বলব, রন্টু...। ব্যস, সব সমস্যার সমাধান।

দপ দপ করে আবার দৌড়ে এসে লোপা বলল, 'ভাইয়া, আপনি আসছেন না কেন?'

'এই তো, চলো।'

লোপাদের বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রুহিনা বেশ রাগী গলায় বলল, 'আপনি এসব কী শুরু করেছেন?'

হেসে ফেললাম আমি, 'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'রন্টুকে আপনি এসব কি শেখাচ্ছেন?'

'কী শেখাচ্ছি মানে?'

'ও দরজা বন্ধ করে আছে সেই কাল রাত থেকে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দরজা বন্ধ করেই আছে।'

'কেন?'

'আপনি জানেন না?'

'এটা কি আমার জানার কথা?'

'আপনি ওর সব জানেন আর এটা জানেন না?'

আমি আবার হেসে ফেললাম, 'কে বলল আমি সব জানি।'

শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রুহিনা বলল, 'আমি তো শুনেছি ও আপনাকে ছাড়া কিছু বোঝে না।'

রুহিনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমি। তারপর উঠে গিয়ে রন্টুর দরজায় টোকা দিয়ে বললাম, 'রন্টু।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে রন্টু দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বলল, 'অর্ণক ভাইয়া, খুব ভালো লাগছে এখন আমার, মনে হচ্ছে আকাশে উড়ে বেড়াই।'

'যাও, গোসল সেরে এসো, একসঙ্গে বসে লেবু-চা খাব।' রুন্টুর আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আন্টি, বাসায় লেবু আছে তো?'

'লেবু তো নাই বাবা।'

'নিচে গিয়ে আমি নিয়ে আসছি।' কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রন্টু দ্রুত দরজা খুলে নিচে চলে গেল।

আন্টি একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'আর কিছু খাবে অর্ণক?'

'আর কী খাব আন্টি?'

'রন্টুর বাবা কাল পাঁচ কেজি খাঁটি গরুর দুধ নিয়ে এসেছে, একটু পায়েস করে দিই?'

'এত কষ্ট করবেন?'

'কষ্ট আর কী, তুমি বসো আমি আসছি।'

আন্টি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুহিনা আগের মতোই রাগ রাগ গলায়

বলল, 'বেশ চেপে বসে আছেন এ ফ্যামিলির ওপর।'

'আপনার তা-ই মনে হয়?' রুহিনার দিকে তাকিয়ে আমি মিটিমিটি হাসতে থাকি।

'মনে হওয়া কি, চোখেই তো দেখছি।'

'আপনার ঈর্ষা হচ্ছে?'

'ঈর্ষা না, রীতিমতো রাগ হচ্ছে।'

'রাগ হওয়া ভালো। রাগের যন্ত্রণা ঈর্ষার যন্ত্রণার চেয়ে কম।'

রুহিনা একটু এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসে বলল, 'আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, রন্টু ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কী করছিল?'

'আপনার কী মনে হয়?'

'আমার কী মনে হবে, আমি ধারণাই করতে পারছি না ওর মতো পুঁচকে একটা ছেলে ঘরের ভেতর একা একা কী করবে।'

'পুঁচকে বলেছেন কাকে?'

'রন্টু পুঁচকে না তো কী?'

'আপনি তো মেডিকেলে পড়েন, আপনার তো ভালো জানার কথা, রন্টুর বয়সী ছেলেদের মাঝেই হঠাৎ করে একটা পরিবর্তন আসা শুরু করে। এ সময় ওরা খুব অস্থিরতায় ভোগে। সে অস্থিরতার কথা না পারে কাউকে বলতে, না পারে সইতে। আচ্ছা, এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। এই যে কয়েক দিন ধরে আপনি বাসায় এসেছেন, একটুর জন্য কি রন্টুর সঙ্গে কোনো গল্প করেছেন?'

'ওর সঙ্গে কী গল্প করব?'

'আছে, করার মতো অনেক রকম গল্প আছে।'

শব্দ করে দরজা খুলে রন্টু নিচ থেকে এসে ঘরে ঢুকল। ওর হাতে কয়েকটা লেবু। ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ অধিকার নিয়ে বলল, 'অর্ণক ভাইয়া, চা খাওয়ার পর আপনি কিন্তু যেতে পারবেন না। আমার ঘরে কিছুক্ষণ বসতে হবে। আপনার সঙ্গে আমার আরো কিছু জরুরি কথা আছে, ভীষণ জরুরি।'

আমি রুহিনার দিকে তাকালাম। রাগে মানুষ হয়ে যায় লাল, রুহিনা হয়ে গেছে নীল। ফরসা চেহারার নিচের নীলচে শিরাগুলো ফুলে উঠেছে ওর। আমি রন্টুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, 'জরুরি কথাটা আজ না বললে হয় না?'

'আজই বলতে হবে আপনাকে। পেটের ভেতর কথাগুলো দলা পাকিয়ে

আছে, সেগুলো বের না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই।'

'ঠিক আছে শুনব। তার আগে চা নিয়ে আসো, আন্টিকে বলবে চিনি একটু বেশি দিতে। লেবু-চায়ে চিনি কম হলে ভালো লাগে না, মনে হয় এমনি এমনি কেবল লেবুর রস খাচ্ছি।' রুহিনার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি চা খাবেন তো?'

'আমি লেবু-চা খাই না।'

'লেবু-চা না খান দুধ-চা খাবেন। ঘরে তো গরুর দুধ আছেই।'

'আপা গরুর দুধের চা-ও পছন্দ করে না, চায়ে দুধের সর ভেসে থাকতে দেখলে নাকি ঘেন্না লাগে। আপা খায় কনডেন্স মিল্কের চা।'

'ঘরে কনডেন্স মিল্ক নেই?'

'না।' রন্টু ভেতরের ঘরে যেতে যেতে বলে।

'রন্টু।'

রন্টু ঘুরে দাঁড়ায়।

'আমরা দুজন বসে বসে চা খাব, আর উনি বসে বসে দেখবেন, এটা কি ঠিক?'

'বেঠিকের কিছু নেই অর্ণক ভাইয়া। এ জগতে কিছু মানুষের সৃষ্টিই হয়েছে অন্যে কী করে তা চেয়ে চেয়ে দেখার জন্য।'

'কথাটা তুমি ঠিক বলেছ। তা তোমাকে কি এখন একটা অনুরোধ করতে পারি আমি?'

'ছি, এটা কী বলছেন অর্ণক ভাই! আপনি আমাকে অনুরোধ করবেন কেন, আপনি তো করবেন আদেশ!'

'অনুরোধই বলো আর আদেশই বলো, কথাটা তোমাকে বলেই ফেলি।'

'তার আগে আমার একটা কথা আছে।'

'বলো।'

'আপনি যদি এ মুহূর্তে বলেন আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে কোথাও ঝুলে পড়তে হবে, আমি রাজি। রাজি মানে কি, এক পায়ে রাজি। কিন্তু যদি বলেন নিচে গিয়ে কনডেন্স মিল্ক আনতে হবে, তাহলে আমার আপত্তি আছে, সর্বান্তকরণে আপত্তি আছে।'

'আপত্তি থাকবে কেন?'

রন্টু আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলে, 'সবার জন্য সবকিছু করা ঠিক না অর্ণক ভাই। সবার জন্য সবকিছু করে মহামানবেরা, আমি মহামানব

নই।'

রন্টু ভেতরের ঘরের দিকে চলে যায়। আমি রুহিনার দিকে তাকাই। সারা মুখ নীল হয়ে গেছে তার। পরিবেশটা স্বাভাবিক করতে আমি হাসতে হাসতে বলি, 'আচ্ছা, বলুন তো দেখি কে বেশি শক্তিশালী—একটা বাঘ, না একজন মন্ত্রী?'

রুহিনা আরো আগুনঝরা চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি সে চোখের দিকেই তাকিয়ে বলি, 'চোখে আগুন আনার সবচেয়ে বড় অসুবিধা কী জানেন, সে আগুন আর কিছুই জ্বালাতে পারে না, কেবল সে চোখকেই জ্বালাতে থাকে।'

'আমি জানি।'

'আর সুবিধাটি কী জানেন?'

রুহিনা এবারও কথা বলে না, তবে চোখে আগুন একটু কম।

'দুঃখিত, সুবিধাটা কী আমি নিজেও জানি না।' হাসতে হাসতে বলি আমি।

'কিন্তু এটা তো জানেন, কে বেশি শক্তিশালী—একটা বাঘ, না একজন মন্ত্রী?'

'জি। ও দুটোর মধ্যে শক্তিশালী হচ্ছে মন্ত্রী। কারণ মন্ত্রীর বাসায় বাঘের চামড়া ঝুলতে দেখা যায়, কিন্তু বাঘের বাসায় কখনো কোনো মন্ত্রীর চামড়া ঝুলতে দেখা যায় না!'

কিছলু ভাইকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখে আমরা যতটুকু না তার দিকে তাকালাম, তার চেয়ে বেশি তাকালাম তার হাতের প্যাকেটটার দিকে। খুব যত্ন করে সেটা নিয়ে এমনভাবে ঘরের ভেতর ঢুকলেন, যেন তিনি ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন কিন্তু এ জিনিসটার কিছু হওয়া যাবে না। সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া মুরগির বাচ্চা হাতে নেওয়ার মতো যত্ন আর আলতো করে ধরে আছেন তিনি প্যাকেটটা।

পল্লব একটু এগিয়ে গিয়ে কিছলু ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটার ভেতর কী আছে কিছলু ভাই?'

'টেলিফোন সেট।' কিছলু ভাই টেবিলে প্যাকেটটা রাখতে রাখতে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন।

'টেলিফোন সেট!

বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলেন কিছলু ভাই। পল্লবের গলার স্বরের ধরন শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, 'অবাক হলে বোধহয়?'

মুচকি হেসে পল্লব বলল, 'জি।'

'কেন?' রাগী গলায় বললেন কিছলু ভাই।

কিছলু ভাইয়ের দিকে তাকাল পল্লব। বোঝার চেষ্টা করল, কতটুকু রেগে গেছেন তিনি। কিন্তু কিছলু ভাইয়ের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না তিনি রেগে গেছেন, কেবল তার গলার স্বরটাই আভাস দিচ্ছে তিনি বেশ উত্তেজিত। পল্লব কিছু বলে না।

'আহ্, কথা বলছ না কেন তুমি!'

'না, এমনি।'

'না এমনি মানে? টেলিফোনের কথা শুনে অবাক হলে কেন তা বলবে তো!'

'না, তেমন কিছু না।

'তোমাদের নিয়ে এই একটা মুশকিল, ঝেড়ে কাশো না। অর্ধেক কথা বের কর, অর্ধেক কথা রেখে দাও পেটের ভেতর।' গজগজ করতে করতে বাথরুমে ঢোকেন কিছলু ভাই।

পল্লব আমার পাশে এসে বসে। তারপর পিঠে আলতো করে একটা চাপড় দিয়ে বলে, 'ওই ঘটনাটা তোর মনে আছে?'

পেপার থেকে চোখ তুলে আমি পল্লবের দিকে তাকাই। কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলি, 'কোন ঘটনাটা?'

'ওই যে কিছলু ভাইয়ের মোবাইল ফোনের ঘটনা?'

কিছলু ভাই এবার দিয়ে মোট তিনবার টেলিফোন সেট আনলেন বাসায়। এবারের ব্যাপারটা কী এখনো জানা হয়নি, কিছলু ভাই বাথরুম থেকে বের হলেই জানা যাবে। কিন্তু আগের ব্যাপার দুটো অন্য রকম।

মোবাইলের মালিক হওয়ার দিকে থেকে আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছেন কিছলু ভাই, প্রথম জন হচ্ছে পল্লব। পল্লবেরটা অবশ্য পোস্টপেইড, কিছলু ভাইয়েরটা প্রি-পেইড। প্রথম প্রথম মোবাইলের মালিক হলে যা হয় তা-ই শুরু হলো আমাদের রুমে। কারণে-অকারণে কিছলু ভাই মোবাইল হাতে নেন, টেপাটেপি করেন, রিংটোন পরীক্ষা করেন, আরো কত কি। কোনো কোনো দিন বাথরুমে যাওয়ার সময়ও তিনি মোবাইলটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। অনেক সময় দেখা যেত মোবাইলটা হাতে নিয়ে তিনি এমনি এমনি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন। কোনো কারণ নেই, একটু পরপর মোবাইলটা হাতে নিয়ে সাদা ধবধবে একটা কাপড় দিয়ে মুছতেনও তিনি। মোবাইল মোছার জন্য এ কাপড়টাও তিনি কিনে এনেছিলেন মোবাইল কেনার পরপরই।

এ সবকিছুই ঠিক ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তখনই সবচেয়ে বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছল, যখন আমরা টের পেলাম কিছলু ভাই ইদানীং রাতে তেমন ঘুমান না। এক রাতে পল্লবের ঘুম ভেঙে যেতেই চোখ মেলে দেখে, কিছলু ভাই তার মোবাইলটা হাতে নিয়ে বসে আছেন। অন্ধকারের মাঝেই তাকিয়ে আছেন মোবাইলটার দিকে। আরেক রাতে রবি দেখে, মোবাইল কানের কাছে ঠেসে ধরে কিছলু ভাই কার সঙ্গে যেন নিচু স্বরে হ্যালো হ্যালো করছেন, অথচ তার মোবাইলে কোনো রিংও আসে নাই, তিনি কাউকে কলও করেন নাই। তিনি একনাগাড়ে হ্যালো হ্যালো করেই যাচ্ছেন। তার কয়েক দিন পর রাতে আমি খেয়াল করি, কিছলু ভাই তার বালিশের পাশে সেই সাদা কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখা মোবাইলটা একটু পরপর বের করছেন, আবার পেঁচিয়ে রাখছেন। অনেকক্ষণ

তিনি এভাবে কাপড় প্যাঁচানো আর কাপড়ের প্যাঁচ খোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

বিরক্তিকর হলেও এ পর্যন্ত আমরা সহ্য করে আসছিলাম। কিন্তু বিরক্তিটা অসহনীয় পর্যায়ে চলে এলো তখনই, যখন আমরা দেখতে পেলাম রাতে না ঘুমিয়ে শুধু চুপি চুপি এমনি এমনি হ্যালো হ্যালো, হাতে মোবাইল নিয়ে বসে থাকা, মোবাইল পেঁচিয়ে রাখা কাপড়টা খোলা আর প্যাঁচোনোতেই এখন সীমাবদ্ধ নেই কিছলু ভাইয়ের পাগলামি। তিনি এখন মোবাইল টেপাটেপি করেন, ফলে মোবাইলের তীব্র আলোতে ঘুম ভেঙে যায় আমাদের, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের মোবাইলের রিংটোনও শুনতে থাকেন মুগ্ধ হয়ে, ঘুম হারাম হয়ে যায় আমাদের সে বিরক্তিকর শব্দেও।

মাঝরাতেই পল্লব একদিন খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'এসব আপনি কী করছেন কিছলু ভাই?'

'কী করছি দেখতে পাচ্ছ না?'

'এ সময় কি দেখার কথা? এখন তো ঘুমানোর কথা।'

'আমি তো সেটাই বলি। না ঘুমিয়ে তোমাকে এসব দেখতে বলেছে কে?'

'দেখতে তো চাই না, তার জন্য চোখ বন্ধ থাকে, কিন্তু শুনতে তো হচ্ছে। আপনার একনাগাড়ে মোবাইলের রিংটোন বাজানো তো একেবারে কানের ভেতর ঢুকে পড়ে।'

'কানও বন্ধ রাখো।'

'কান বন্ধ রাখব কী করে?'

'সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে?' কিছলু ভাই কিছুটা শব্দ করে বলেন, 'বালিশ কানের ওপর চেপে ধরো।'

'বালিশ কানের ওপর চেপে ধরলে মাথা রাখব কিসের ওপর?'

'মাথা কোথায় রাখবে মানে, মাথা খাটের ওপর রাখবে! বালিশে কিছুক্ষণ মাথা না রাখলে কোনো অসুবিধা হবে?' কিছলু ভাই কিছুটা ভাষণ দেওয়ার মতো করে বলেন, 'শোনো পল্লব, এ দুনিয়ার অনেক মানুষই এখন ঘুমাচ্ছে, কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, অনেকের মাথার নিচে কোনো বালিশ থাকা তো দূরের কথা, একটা ইটও নেই। তারা কিন্তু ঘুমাচ্ছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাদের। অসুবিধা কেবল তোমার, সামান্য মোবাইলের শব্দে ঘুমাতে পার না, যত্তসব!'

পল্লব কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিই ওকে। পল্লব টেরই পায়নি ঘুম ভেঙে গেছে আমারও, এতক্ষণ সব কথা শুনেছি

আমিও। ও আমার দিকে ঘুরে শুতেই ফিসফিস করে বললাম, 'কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করব।'

সকালে ঘুম ভেঙেই দেখি জানালার পাশে মুখ গম্ভীর করে বসে আছে পল্লব। বিছানা থেকে উঠে বসে বলি, 'কিরে, কী হয়েছে?'

'রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয়নি, মেজাজ খিচড়ে আছে।'

'কিছলু ভাই কই?'

'অফিসে।'

'রবি?'

'বাথরুমে।'

'নাশতা করেছিস?'

'না, আজকেও বুয়া আসেনি।'

'তাহলে নিচে গিয়ে হোটেল থেকে নাশতা নিয়ে আয়। নাশতা করতে করতে বুদ্ধি বের করতে হবে কী করা যায়। যদিও অলরেডি একটা বুদ্ধি আমি বের করে ফেলেছি।'

জানালার পাশ থেকে সরে এসে পল্লব বলে, 'কী বুদ্ধি?'

'আগে নাশতা আনো, নাশতা করতে করতে বলি।'

পল্লব না, বাথরুম থেকে বের হয়ে রবি নিচে গিয়ে নাশতা নিয়ে আসে। পরোটার এক কোনা ছিঁড়তে ছিঁড়তে আমি পল্লবের দিকে তাকাই। ও আগের মতোই মুখটা গম্ভীর করে আছে।

'শোন, কিছলু ভাইয়ের মোবাইলে তোর কোন নম্বরটা সেভ করা আছে?' পল্লবকে জিজ্ঞেস করি আমি।

'এখন যেটা মোবাইলে ইউজ করছি, সেটা।'

'তোর তো আরেকটা সিম আছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা অ্যাকটিভ আছে তো?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ওটাও ইউজ করি তো।'

'কিছলু ভাই আজ বাসায় ফিরে মোবাইলটা টেবিলে রেখে যখন বাথরুমে যাবেন, ঠিক তখনই একটা কাজ সেরে ফেলতে হবে।'

পল্লব আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বেশ আগ্রহী হয়ে বলে, 'কী কাজ?'

'তোর আরেকটা সিমের নাম্বারও সেভ করে দিবি কিছলু ভাইয়ের মোবাইলে। তবে অন্য নামে।'

'কোন নামে?'

'জিপি নামে।'

'এটা তো গ্রামীণফোনের নাম!'

'হ্যাঁ, গ্রামীণফোনের নাম।'

'গ্রামীণফোনের নামে আমার নাম্বার সেভ করতে যাব কেন?' পল্লব কিছুটা প্রতিবাদী হয়ে বলে।

'কাজ আছে।' এটুকু বলে আমি আর কিছু বলি না।

বিকেলে কিছলু ভাই বাসায় ফিরে বাথরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পল্লবকে ইশারা করি আমি। পল্লব দ্রুত ওর অন্য নাম্বারটা সেভ করে ফেলে কিছলু ভাইয়ের মোবাইলে। আমি কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলি, 'কোন নামে সেভ করেছিস?'

'কেন, জিপি নামে!'

'গুড, এখন আর কিছু করতে হবে না। বাকি আর কী কী করতে হবে রাতে বলে দেব।'

রাত দুইটার সময় কিছলু ভাই খাট কাঁপিয়ে আমাকে ডেকে তুলে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'অর্ণক, দেখো তো কী ভয়ানক একটা মেসেজ এসেছে আমার মোবাইলে!'

পল্লব আমাকে একটা চিমটি কাটল, রবি খুক্ করে একটা কাশি দিয়ে পাশ ফিরে শুলো আর আমি ঘুমজড়ানো গলায় কিছলু ভাইকে বললাম, 'কে পাঠিয়েছে মেসেজটা?'

কিছলু ভাই মোবাইলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'দেখা তো যাচ্ছে জিপি থেকে।'

'জিপি মানে গ্রামীণফোন থেকে?'

'হ্যাঁ।'

আগের মতোই শুয়ে থেকে কোনোরকম আগ্রহ না দেখানোর ভান করে বললাম, 'কী লিখেছে?'

'লিখেছে—ডিয়ার সাবসক্রাইবার, আমাদের কোম্পানির গ্রাহক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। আপনার জন্য একটা সুখবর আছে। সুখবরটা হলো, আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার পরিচিত-অপরিচিত একশ জনের মোবাইলে একটা করে মেসেজ পাঠাবেন। এতে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে যত টাকা কাটা যাবে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা

আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে পৌঁছে যাবে আপনার অ্যাকাউন্টে। এ সুযোগ অল্প সময়ের জন্য। হেলায় এ সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না।'

'তাই নাকি!' লাফ দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসি আমি, 'খুবই ভালো একটা জিনিস ওরা অফার করেছে আপনাকে।'

'কিন্তু আমি তো জানি গ্রামীণফোন থেকে কোনো মেসেজ এলে সেটা ইংরেজিতে আসে, এটা অবশ্য ইংরেজিতেই এসেছে, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে, আসার কথা তো ইংরেজি উচ্চারণে!'

'আপনি তো রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে সিমটা নিয়েছেন। সেই ফরম দেখে হয়তো কোম্পানির লোকজন বুঝতে পেরেছে আপনি ইংরেজি তেমন ভালো জানেন না, তাই বাংলাতেই পাঠিয়েছে আর-কি।'

'তো কী বলো, একশ জনকে মেসেজ পাঠাব আমি?'

'অবশ্যই।'

'তোমার তো মোবাইল নেই, তুমি এ বিষয়ে বোধহয় ভালো জানো না। পল্লবকে ডাকো তো একটু, ওর তো মোবাইল আছে। ও সবকিছু ভালো বুঝবে।'

আমাকে ডাকতে হলো না, উত্তেজনায় নিজেই ডেকে তুলে পল্লবকে মেসেজটা দেখালেন কিছলু ভাই। পল্লব সঙ্গে সঙ্গে কিছলু ভাইয়ের পিঠে জোরসে একটা থাপ্পড় মেরে বলল, 'এটা তো গ্রেট একটা সুযোগ। শুনেছি, গ্রামীণফোন নাকি মাঝে মাঝে তাদের গ্রাহকদের মধ্য থেকে তাদের পছন্দমতো কোনো কোনো গ্রাহককে এমন সুয়োগ দেয়।' পল্লব কিছলু ভাইয়ের পিঠে আরেকটা থাপ্পড় মেরে বলে, 'ভাই, আপনের কপাল একটা! মোবাইল কেনার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা পেয়ে গেলেন।'

কিছলু ভাই কিছুটা দ্বিধা নিয়ে পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি তাহলে কী বলো?'

'আমি কী বলি মানে, আপনি মেসেজ পাঠাবেন।'

'পাঠাব?' আগের মতো দ্বিধা ঝরে পড়ে কিছলু ভাইয়ের কণ্ঠে।

'অবশ্যই।'

'তার আগে একটা কথা।' আমি কিছলু ভাইয়ের পিঠে একটা হাত রেখে বলি, 'এ সুবর্ণ সুযোগ উপলক্ষে আপনাকে কিছু খরচ করতে হবে। যেহেতু ডাবল টাকা আপনি রিটার্ন পাচ্ছেন সেহেতু মাত্র একশ টাকা খরচ করলেই হবে। মাত্র একশ টাকা।'

'এই এক শ টাকা দিয়ে কী করবে?' গলার স্বরটা কেমন যেন একটু শুকনো শুকনো লাগে কিছলু ভাইয়ের।

'সারা রাত সিরাজের দোকানে পরোটা আর মাংস বিক্রি হয়, আমরা এখন সে মাংস আর পরোটা খাব।'

'আনবে কে?'

'কেন, রবি যাবে!'

কষ্টমাখা চেহারা নিয়ে বালিশের তলা থেকে মানিব্যাগটা বের করে কিছলু ভাই এক শ টাকা দেন আমার হাতে। রবি আমাদের কথা শুনে আগেই বিছানায় উঠে বসেছে। আমি ওর হাতে টাকাটা দিলাম। অন্য কোনো সময় হলে রবি একবারের জন্য হলেও এই ছয়তলা থেকে নামা আবার এই ছয়তলা বেয়ে ওঠার জন্য ভেটকি দিয়ে উঠত, কিন্তু এই মাঝরাতে ও তেমন কিছুই করল না। হাসি হাসি মুখ করে সে সিরাজের দোকানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল এবং মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে মাংস আর পরোটা নিয়ে ফিরেও এলো রুমে।

সশব্দে আমরা মাংস-পরোটা খেতে লাগলাম আর কিছলু ভাই অতিভক্তি নিয়ে একটা একটা করে মেসেজ পাঠাতে লাগলেন তার পরিচিত-অপরিচিত সব নম্বরে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কিছলু ভাই চিৎকার করে ডেকে তুলে আমাকে বললেন, 'অর্ণক, আরেকটা মেসেজ এসেছে।'

ঘুমে চোখ খুলতে পারছি না। তবু জোর করে চোখ মেলে বললাম, 'এখন কী লিখেছে?'

'লিখেছে—ডিয়ার সাবসক্রাইবার, ধন্যবাদ এক শ মেসেজ পাঠানোর জন্য, আপনাকে এখন অন্য আরেকটা কাজ করতে হবে। কাজটা হলো, যাদের মেসেজ পাঠিয়েছেন আপনি, আজ রাত দুইটার পর থেকে তাদের একটা করে কল করবেন। কল করে আবার তাদের ধন্যবাদ জানাবেন। আগে ছিল মেসেজের মাধ্যমে, এবার হবে মৌখিকভাবে। আমাদের কোম্পানি আপনার মেসেজ আর কল খরচের দ্বিগুণ টাকা একসঙ্গে আপনার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে অতিসত্বর।'

'বলেন কি আপনি!' লাফ দিয়ে উঠে বসি আমি বিছানায়, 'আপনি তো বড়লোক হয়ে যাচ্ছেন কিছলু ভাই!' পল্লবের মতো একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করে কিছলু ভাইয়ের পিঠে। কিন্তু সেটা আর করা হয় না, বরং তার একটা কাঁধ ছুঁয়ে বলি, 'আমার তো মনে হচ্ছে, আপনাকে অল্প কদিনের মধ্যে একসময়

বাড়ি-গাড়ির অফারও করতে পারে মোবাইল ফোনের কোম্পানি থেকে।'

'তা নাহয় করল, কিন্তু আমার খটকা লাগছে রাত দুইটার পর সবাইকে ফোন করতে বলল কেন আমাকে।'

'রাত দুইটার সময় সমস্ত কিছু নিরিবিলি থাকে তো, তাই সে সময় ফোন করলে সবাই খুশি হবে ভেবে করতে বলেছে।'

'তাহলে তুমি করতে বলছ?'

'অবশ্যই, এমন সুযোগ সব সময় আসে না কিছলু ভাই। আপনি ভাগ্যবান, ভাগ্যবানদের কপালেই এসব আসে।'

'পল্লবকে একটু জানানো দরকার না?'

'ও তো এখন ঘুমাচ্ছে, পরে জানালে চলবে। রাতে কারোই তেমন ঘুম হয়নি। আপনি আরো একটু ঘুমান, অফিসের তো দেরি আছে।'

'রাতে একফোঁটা ঘুম আসেনি, এখনো বোধহয় আসবে না।'

'চেষ্টা করুন।'

'চোখ বুজলেই শুধু মোবাইলের ছবি ভেসে ওঠে, ঘুম আর আসে না।' কিছলু ভাইয়ের চেহারাটা কেমন কাঁদো কাঁদো দেখায়।

রাত দুইটার পর থেকে কিছলু ভাই পুরোদমে একের পর এক ফোন করতে থাকেন। তিনি আন্দাজে একটা নম্বর টেপেন, ওপাশ থেকে কেউ রিসিভ করলেই হাসি হাসি মুখ করে তিনি বলেন—আপনাকে ধন্যবাদ। তারপর লাইনটা কেটে দিয়ে আরেকটা ফোন নম্বর টিপতে থাকেন। রাত দুইটায় তিনি শুরু করেন, শেষ হয় সেটা শেষরাতে। কিন্তু সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক ফোন আসতে থাকে কিছলু ভাইয়ের মোবাইলে। কিছলু ভাই একটা করে ফোন রিসিভ করেন আর বেদম ঝাড়ি খেয়ে ফোনটা কেটে দেন। এভাবে ঝাড়ি খেতে খেতে শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, না, এ মোবাইল ফোন তিনি আর রাখবেন না, আজই বেচে দেবেন এটা।

মোবাইলটা সত্যি সত্যি বেচে দেন কিছলু ভাই। কিন্তু বাসায় ফেরেন একটা টিঅ্যান্ডটির টেলিফোন সেট হাতে নিয়ে। ঘরে ঢুকেই বলেন, 'শালার মোবাইলই আর ব্যবহার করব না! এখন থেকে এই টিঅ্যান্ডটির ফোনই ব্যবহার করব।' কিন্তু এক মাস দৌড়ঝাঁপ করার পর যখন বুঝলেন টিঅ্যান্ডটির লাইন পাওয়া আর সোনার হরিণ পাওয়া এক কথা, তখন এ টেলিফোন সেট বেচে আবার একটা মোবাইল ফোন কিনে আনেন তিনি এবং রাত-বিরাতে টেপাটিপি শুরু করেন যথারীতি। এত দিন আমরা শান্তিতে ঘুমাতাম, কিন্তু সে শান্তি আর

কপালে সয় না। আরেকটা বুদ্ধি বের করতে হয় আমাদের, এর জন্য আরেকটা মোবাইলের সিম কিনতে হয় এবং সে সিম থেকেই একেকটা মেসেজ পাঠাতে থাকি কিছলু ভাইয়ের মোবাইলে, তবে এবার অন্য নামে। আমরা এবার মেসেজ পাঠাই তিন্নির নামে, যে তিন্নিকে আমরা চিনি না, জানিও না, কিন্তু তার বয়স আঠারো, সুন্দরী এবং কলেজে পড়ে সে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রায় বিশ দিন তিন্নি সেজে কিছলু ভাইকে ভীষণ ব্যস্ত রেখেছিলাম আমরা, বেশ কিছু খরচও করিয়েছিলাম তাকে। শেষে কেমন করে যেন তিনি একদিন টের পান, দুনিয়াতে অনেক তিন্নি আছে, কিন্তু তার কাছে যে তিন্নি কেবল মেসেজ পাঠায় এবং তার পরই ফোনটা বন্ধ করে রাখে, কোনো কলও করে না সে, কোনো কলও যায় না তার মোবাইলে, সে তিন্নির আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। অন্তত নামে আছে, জীবন্ত নেই।

হৃদয় কিংবা মন ভাঙার কারণেই হোক দ্বিতীয়বারের মতো মোবাইল ফোনটা বেচে দেন কিছলু ভাই, বাসায় ফেরেন একটা টিঅ্যান্ডটির টেলিফোন সেট হাতে নিয়ে এবং যথারীতি সেটাও বেচে দেন কয়েক দিন পর।

তৃতীয়বারের মতো কিছলু ভাই আরেকটা মোবাইল ফোন কেনেন, কিন্তু এবার আর তিনি রাত-বিরাতে ফোন নিয়ে কোনো টেপাটিপি করেন না। আমাদেরও আর কোনো পরিকল্পনা করতে হয় না, ফোনের প্রতি বিরক্ত হয়ে ফোনও আর বেচে দিতে হয় না তাকে। কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, কিছলু ভাইয়ের তো মোবাইল ফোন একটা আছেই, তিনি আজ আরেকটা টিঅ্যান্ডটির সেট কিনে আনলেন কেন বাসায়।

বাথরুম থেকে বের হয়ে এসেছেন কিছলু ভাই। এবার আমি একটু হেসে হেসে বলি, 'টেলিফোনটা আনার কারণ কী কিছলু ভাই?'

গম্ভীর হয়ে কিছলু ভাই বলেন, 'কারণ আছে।'

'কারণটা বলা যাবে?'

'যাবে, তবে এখন না।'

'কখন?'

'আমি এখন একটু ঘুমাব, সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে বলব। আচ্ছা, আজও বুয়া আসেনি না?'

'তিন দিন তো হয়ে গেল।'

'ওই শালিকে আর রাখা যাবে না, কদিন পরপরই ফুট্টুস, আজ জ্বর তো, কাল মাথা ধরা। যত কিছু ওই শালির হয়, আমাদের হয় না।' কিছলু ভাই

বিছানায় বসতে বসতে বলেন, 'অর্ণক, আরেকটা বুয়ার খোঁজ করো।'

'আরো দু-একটা দিন দেখি না কিছলু ভাই।' কিছলু ভাইয়ের পাশে বসে বলি, 'আচ্ছা, আপনার বাবার প্রস্রাব পরীক্ষার কী হলো?'

'প্রস্রাবই নাই, তার আবার পরীক্ষা হবে কীভাবে?'

'কিন্তু আপনার বাবাকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে তো। আঙ্কেল তো মাঝে মাঝেই ফোন করেন এর জন্য।'

'হ্যাঁ, এটা নিয়ে বেশ চিন্তায় আছি। বাড়ি গিয়ে আবার যে প্রস্রাব নিয়ে আসব সে সময়টা পাচ্ছি না।'

'আপাতত আপনি একটা কাজ করতে পারেন।'

বিছানায় শুতে শুতে কিছলু ভাই বলেন, 'কী কাজ?'

'আপনি আপনার নিজের প্রস্রাব পরীক্ষা করে সে রিপোর্ট আঙ্কেলের নামে পাঠাতে পারেন।'

'কী!' কিছলু ভাই উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসেন, 'এটা একটা কথা বললে তুমি! আমার প্রস্রাব পরীক্ষা করে আমি সেটা বাবার নামে পাঠাব!'

'অসুবিধা কোথায়, এটা তো সাময়িক। পরে আপনি সময়মতো বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর আবার কাজটা করলেই হলো।'

'তুমি বলছ অসুবিধা নাই?' কিছলু ভাই রাগ করে আমার পেটে একটা খোঁচা মেরে বলেন, 'এই মিয়া, নিজের প্রস্রাব কখনো বাপের প্রস্রাব হিসেবে চালানো যায়?'

'কিন্তু রক্তের দরকার হলে তো বাপ ছেলেকে, ছেলে বাপকে রক্ত দিতে পারে, সেখানে তো কোনো অসুবিধা হয় না।'

'রক্ত আর প্রস্রাব এক হলো?'

'এক না তো কী, দুটোই পানি—একটা লাল, একটা হলদেটে।'

রাগে ফুলে যাচ্ছেন কিছলু ভাই। আমি আলতো করে তার পাশ থেকে উঠে পড়ি। হাতঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠি। সর্বনাশ, চিকন সুতার মতো একটা দড়ি দিয়ে মোটা-তাজা একটা ষাঁড়কে হয়তো বেঁধে রাখা সম্ভব, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত লোহার শেকল দিয়েও আমাকে বেঁধে রাখা সম্ভব না, অন্তত এ সময়টাতে, এই বিকেলবেলাতে। দ্রুত শার্টটা চেঞ্জ করে, মাথাটা আঁচড়িয়ে, গায়ে একটু পারফিউম লাগিয়ে যেই না রুম থেকে বের হব, তার আগেই পল্লব অবাক করা চেহারা নিয়ে বলল, 'কই যাস এই অসময়ে?'

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। রাগ হলো পল্লবের ওপর। শুভ কাজে যাওয়ার

সময় পিছু ডাক! প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বললাম, 'কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'বলা যাবে না।'

'তুই ইদানীং বেশ মিথ্যা কথা বলিস, আবার এক ধরনের নেতা নেতা ভাবও এসেছে তোর মধ্যে।'

'তাই নাকি?'

'তা নয় তো কী?'

'তাহলে এবার বল তো, একজন মিথ্যাবাদী আর একজন নেতার মধ্যে পার্থক্য কী?' পল্লবের দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকাই আমি।

'এ দুটোর মধ্যে আবার পার্থক্য কী?'

'আছে।' আমি আবার হাসতে হাসতে বলি, 'সব নেতাই মিথ্যাবাদী, কিন্তু সব মিথ্যাবাদী নেতা নয়।'

বাসার সামনের রাস্তাটায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে রন্টুর সঙ্গে দেখা। ওর হাতে লাইলনের লম্বা একটা দড়ি। আমাকে দেখেই বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল, 'অর্ণক ভাই, এটা দিয়ে হবে না?'

দড়িটার দিকে ভালো করে তাকাই আমি, 'একটু বেশি মোটা হয়ে গেল না?'

রন্টু আমার কথার জবাব না দিয়ে দড়িটা আবার দেখতে থাকে। আমি ওর কাঁধে হাতে রেখে বলি, 'অসুবিধা নেই, এটা দিয়েও হবে। তবে একটু সাবধান থাকতে হবে, যেন গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে না যায় এটা।'

'তা পেঁচাবে না। থুতনির নিচ থেকে দড়িটা নিয়ে মাথার ওপরে গোল করে একটা গিঁটু দেব, কিছুটা ফাঁসির দড়ির মতো।'

'হ্যাঁ, ফাঁসির দড়ির গিঁট থাকে ঘাড়ের কাছে, আর তোমার এ দড়ির গিঁট থাকবে মাথার খুলির ওপরে।'

'তারপর বাকি অংশ টানটান করে ঝুলিয়ে দেব ছাদের একটা লোহার সঙ্গে।'

'না, এ ক্ষেত্রে ছাদের লোহার সঙ্গে তোমাকে দড়ির একটা অংশ আগে বাঁধতে হবে, পরে আরেক অংশ বাঁধতে হবে তোমার মাথার সঙ্গে।' আমি একটু বুঝিয়ে বলি।

'জি, তারপর চোখ দুটো সামনের টেবিলের ওপর মেলে দিয়ে সম্পূর্ণ

মনোযোগের সঙ্গে বসে থাকতে হবে, যাতে ঘুম এলেও ঢলে না পড়ি কোনো দিকে।'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ না তোমার ভেতর কবিতা লেখার সম্পূর্ণ ভাব আকুপাকু করে না আসে, ততক্ষণ এভাবে তোমাকে বসে থাকতে হবে।'

'ভালো কবিতা লেখার জন্য এটা সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের পদ্ধতি, তাই না অর্ণক ভাই?' খুব আগ্রহ নিয়ে রন্টু আমার দিকে তাকায়।

'অবশ্যই। তোমাকে তো আগেই বলেছি, কোনো এক লেখক পানিভর্তি বালতিতে পা চুবিয়ে লিখতেন, কেউ লেখার সময় মুখ ভর্তি করে পান খেতেন, কেউ একেবারে নেশায় চুর হয়ে লিখতে বসতেন, কেউ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েও লিখতেন। এরা সবাই কিন্তু বিখ্যাত লেখক ছিলেন। আচ্ছা, এর আগে তুমি কি ঘর বন্ধ করে লিখতে বসেছিলে?'

'কবে?'

'ওই যে, কাল না পরশু তোমাকে বন্ধ ঘর থেকে বের করার জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তোমার আম্মা।'

'ও হ্যাঁ, লিখতে বসেছিলাম।'

'কীভাবে বসেছিলে?'

রন্টু বলতে নিয়ে লজ্জা পায়। আমি ওর লজ্জা কাটাতে বলি, 'ও বুঝেছি। তা জামা-কাপড় সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে বসেছিলে, না এক টুকরো সঙ্গে রেখেছিলে?'

'সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে বসেছিলাম।'

'কেমন লেখা হয়েছিল?'

'একদম হয়নি।'

'কেন?'

'যখনই একটা অক্ষর লিখতে যাই, তখনই চোখ চলে যায় ঘরের এদিক-ওদিক। মনে হয় কেউ না কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, হয় কোনো একটা টিকটিকি তাকিয়ে আছে, নাহয় একটা তেলাপোকা তাকিয়ে আছে, কিংবা ঘরের কোনো ছিদ্র দিয়ে কোনো মানুষ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এক ধরনের অস্বস্তিতে থেকেছি সারাক্ষণ, একদম লিখতে পারিনি তাই। আচ্ছা, ন্যাংটো হয়ে যে লেখকটা লিখতে বসতেন, তিনি লিখতেন কীভাবে?' প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য রন্টু আমার দিকে প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে তাকায়। আমি কোনো উত্তর দিই না। পরে কথা বলব বলে ইশারা করে ওকে চলে যেতে বলি। কারণ আমার চোখের

কোনা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম তিনতলার জানালাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে এবং এইমাত্র সেটা সম্পূর্ণরূপে খুলে গেল।

রন্টু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অতিশয় ভদ্র ছেলের মতো পায়চারি করতে থাকি বাসার সামনে দিয়ে। একটু একটু করে পায়চারি করি আর একটু একটু করে চোখের কোনা দিয়ে তিনতলার দিকে তাকাই। না, শূন্য জানালা, কেউ বসে নেই সেখানে থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে, কিংবা চুল ছড়িয়ে কেউ তাকিয়েও নেই উদাস হয়ে, অথবা কোনো গল্প বা উপন্যাস নিয়ে বসেও নেই কেউ মনোযোগী হয়ে। তবু হতাশ তো নই-ই, আশাবাদী হয়ে আরো নিবিষ্ট হয়ে পায়চারি করতে থাকি আমি।

সপ্তমবারের মতো চোখ দুটো তিনতলার দিকে তুলতেই চমকে উঠি আমি। চোখ দুটো তিনতলার দিকে যাওয়ার আগেই দেখতে পাই দোতলার জানালাটা খোলা, সম্পূর্ণ হাঁ করে খোলা। সেখানে বসে আছে শিমু, যে আবার তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমার আবার যার দিকে তাকানো নিষিদ্ধ, অ্যাথলেটদের শক্তিবর্ধক অষুধ নেওয়ার মতো নিষিদ্ধ।

পায়চারি থেমে যায় আমার। এ মুহূর্তে কী করা দরকার বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে চোখ দুটো যেই না আবার ওপরের দিকে তুলেছি, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠি। তিনতলার জানালায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, যার জন্য আমি পায়চারি করছি সে দাঁড়িয়ে আছে, রুহিনা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে সুদূরে, যেখানে আমি তো নেই-ই, আমার ছায়াও নেই।

একটু আগে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এখন টের পাচ্ছি কেমন যেন শক্ত হয়ে আসছে আমার শরীরটা, নড়াচড়া করতে পারছি না আমি, হাত ঘেমে যাচ্ছে, পা দুটো স্থির হয়ে আছে গাছের মতো।

অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পর চোখ দুটো সামান্য তুলে ওপরের দিকে তাকানোর চেষ্টা করি। তিনতলার জানালাটা আগের মতোই খোলা, কিন্তু সেখানে আর কেউ নেই, শূন্য। কেবল জানালার নীলচে পর্দাটা একা একাই দোল খাচ্ছে। দোতলার জানালাটাও খোলা, সেটা শূন্য নয়, অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে এক বালিকা, সেই বালিকা, নিষিদ্ধ বালিকা।

সত্যি সত্যি বুঝতে পারছি না এ মুহূর্তে কী করা উচিত, মাথায় কিছু আসছেও না। তিনতলার শূন্য জানালার মতোই শূন্য হয়ে আছে মাথাটা।

চোখ দুটো আবার ওপরের দিকে তুললাম। না, তিনতলার জানালাটা

শূন্যই আছে। শূন্য হয়ে যাচ্ছে আমার বুকের ভেতরটাও, হাহাকার করা শূন্য।

রাস্তায় আর ভালো লাগছে না। বাসায় ফেরা দরকার। সিঁড়ি ভেঙে দোতালার প্রধান দরজার কাছে আসতেই আলতো করে খুলে যায় দরজাটা। সম্পূর্ণ মুখ না, শুধু দুটো চোখ উঁকি দেয়, হাসি হাসি দুটো চোখ। আমি সে হাসির জবাবে কেবল এক টুকরো হাসিই ফিরিয়ে দিই, এ ছাড়া আর কোনো কিছু দেওয়ার নেই আমার এ মুহূর্তে।

চোখ দুটো হাসছেই, আমি সে হাসি পেছনে ফেলে চলে আসি। এ ছাড়া আর কোনো কিছু করারও নেই আমার এ মুহূর্তে।

কিছলু ভাইয়ের রুমে ঢুকে অবাক হয়ে যাই আমি। তার ঘরের কাঠের টেবিলটা চমৎকার করে সাজিয়েছেন তিনি। টেবিলের ওপর একটা ফুলদানি, সেখানে কয়েকটা লাল টকটকে প্লাস্টিকের গোলাপ; একটা পেপার ওয়েট; একটা কলমদানি; আর টেবিলের ডান পাশের কোনায় সেই টেলিফোন সেটটা।

চেয়ারটার ওপরও সম্পূর্ণ রঙিন একটা তোয়ালে মেলে রেখেছেন, বড়লোকদের অফিসের চেয়ারে যেমন থাকে আর-কি। টেবিলের সামনেও দুটো চেয়ার পাশাপাশি রেখেছেন, তবে সে দুটোতে কোনো তোয়ালে নেই। রুমটা বেশ পরিষ্কার, ঝকঝক তকতক করছে। জানালায় নতুন একটা পর্দাও লাগিয়েছেন তিনি। যে কিছলু ভাইয়ের বিছানা সব সময় দোমড়ানো মোচড়ানো থাকত, সে বিছানাটাও টানটান করা, তার কালচেটে হওয়া বালিশটাও ছোট একটা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। মোট কথা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে তার পরিবেশ।

আমাকে দেখেই বেশ ভাব নিয়ে কিছলু ভাই বললেন, 'আসো অর্ণক, আসো।'

একটু এগিয়ে যেতেই তিনি আগের মতোই ভাব নিয়ে বললেন, 'বসো, ওই সামনের যেকোনো একটা চেয়ারে বসো।'

চেয়ারে বসেই আমি একটু আমতা আমতা করে বলি, 'এসব কেন কিছলু ভাই?'

আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছলু ভাই বনে, 'কোন-সবের কথা বলছ তুমি অর্ণক?

'এই যে, ঘরের সবকিছু অন্য রকম। কেমন যেন বড়লোকদের অফিস অফিস মনে হচ্ছে।'

হেলান থেকে উঠে এসে এবার সোজা হয়ে বসেন কিছলু ভাই। একটু

ঝুঁকেও বসেন আমার দিকে। তারপর পরম তৃপ্তির চেহারা করে মাপা একটা হাসি দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'তাহলে এ ঘরটা সাজানো আমার ঠিকই আছে। বড়লোকদের অফিসের মতোই হয়েছে, না?'

'জি।'

'এতে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে আমার অর্ণক, অনেকগুলো টাকা।'

'তা তো হবেই।'

'তবু সার্থক যে অফিসটা বড়লোকদের অফিসের মতো হয়েছে। অন্তত তুমি বলছ?' কিছলু ভাই চেহারা আবার তৃপ্তিময় করে ফেলেন।

আমি আবার ইতস্তত করে বলি, 'একটা প্রশ্ন করব কিছলু ভাই?'

'অবশ্যই। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই তো আমি।'

'আপনি রুমটা এভাবে সাজালেন কেন?'

'ভালো প্রশ্ন করেছ। একটু পর আমি নিজেই তোমাদের বলতাম, কিন্তু প্রশ্নটা যেহেতু তুমি করেই ফেলেছ, তাই এখনই বলছি। তার আগে পল্লব আর রবিকে ডেকে আনো।'

রবি আর পল্লব ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কিছলু ভাই সেই ভাব নিয়েই বললেন, 'পল্লব আর অর্ণক, সামনের চেয়ার দুটোতে বসো, রবি বসো বিছানার ওপর।'

কিছলু ভাই আবার চেয়ারে হেলান দিলেন। তারপর থুতনিতে একটা হাত ঠেকিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যে চাকরিটা করি, সেটা খুব ছোটখাটো চাকরি। তা দিয়ে আসলে পোষাচ্ছিল না। বিয়েশাদি করিনি, বিয়ে করতে হবে, সংসারে আরেকটা মানুষ আসবে, কয়েক দিন পর আরো দু-একজন আসবে, খরচ বাড়বে, বড় বাসা নিতে হবে, এর জন্যই একটা ব্যবসা শুরু করলাম আর-কি।'

'কী ধরনের ব্যবসা শুরু করছেন আপনি?' পল্লব খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আমার ব্যবসাটা আসলে বহুমুখী। এই ধরো, আমি তো চিঠি লিখে দিই, এটা তো তোমরা জানো। আমার লেখা প্রেমপত্র নিয়ে সাধারণত কেউ বিফল হয়নি, প্রেমিকশ্রেণীর কাছে এতে আমার বেশ সুনামও আছে। মাসে অন্তত সাত-আটটা চিঠি তো আমি লিখিই। এখন থেকে আমি এখানে বসেই চিঠিগুলো লিখব। তোমরা হয়তো এটাও জানো, সুন্দর পরিবেশে কোনো কিছু করলে সে

জিনিসটা সুন্দরই হয়ে, এখন থেকে চিঠি লেখাও সুন্দর হবে। ফলে সেসব সফল হবে, আমার প্রসারও আরো বেড়ে যাবে। এটা হলো একটা। দ্বিতীয়টা হচ্ছে— ।' কিছলু ভাই একটু থেমে বলেন, 'আচ্ছা, তোমরা চা খাবে তো?'

রবি একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'চা'র ব্যবস্থাও আছে নাকি এখানে?'

'অবশ্যই। দুধ-চা, দুধ ছাড়া চা, চিনি-চা, চিনি ছাড়া চা—সবকিছুর ব্যবস্থা রেখেছি আমি। সঙ্গে বেশ ভালো বিস্কুটও। ক্লায়েন্টদের আপ্যায়ন করতে আর-কি। '

'কফির ব্যবস্থা নেই?'

'না, আপাতত কফির ব্যবস্থা নেই। তবে পরিকল্পনায় আছে। ব্যবসা একটু জমে উঠলেই শুধু কফি কেন, কোক, পেপসি, ড্রিঙ্কস সবই রাখব।' কিছলু ভাই বেশ আনন্দ নিয়ে বলতে থাকেন।'

'এগুলো তো সফট ড্রিঙ্কস, কোনো হার্ড ড্রিঙ্কস রাখবেন না?' পল্লব হেসে হেসে জিজ্ঞেস করে কিছলু ভাইকে।

কিছলু ভাই রেগে যেতে নিয়েই কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে যান, 'দেখো, তোমার কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল, কিন্তু এ ধরনের ব্যবসা করতে গেলে কোনোভাবেই রাগা যাবে না আমার, তাই রাগলাম না। তুমি যে প্রশ্নটা করলে এবার আমি প্রশ্ন করি, এ ধরনের ব্যবসায় কি কখনো হার্ড ড্রিঙ্কস রাখার ব্যবস্থা করতে হয়?'

'অবশ্যই হয়।' পল্লব উত্তর দেওয়ার আগেই আমি কিছলু ভাইয়ের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলি, 'বড় বড় ব্যবসায় সব সময় হার্ড ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা থাকে। আপনি কি মনে করেন, আপনার ব্যবসা সারা জীবন এমন ছোটখাটোই থাকবে, কখনো বড় হবে না?'

কিছলু ভাই একটু দ্বিধা নিয়ে বলেন, 'তা বড় হবে।'

'তখন তো আপনাকে হার্ড ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে, ব্যবসা তো আগে বড় হোক, তখন দেখা যাবে।' কিছলু ভাই চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার ভাব নিয়ে বলেন।

'আরেকটা ড্রিঙ্কসের কথা কিন্তু বাদ গেল।' পল্লব উৎসাহী হয়ে মুখটা হাসি হাসি করে বলে।

'কোন ড্রিঙ্কসের কথা বলছ তুমি?'

'ওই যে ডাবের পানি।'

'হ্যাঁ, সেটাও রাখা হবে।'

রবি দু হাত একসঙ্গে করে কচলাতে কচলাতে বলে, 'কিছলু ভাই, আমি একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'আপনার ব্যবসা যখন বড় হবে, তখন কি আমাদের জন্য কোনো চাকরির ব্যবস্থা থাকবে?'

'এটা তুমি কী বললে রবি! তোমরা আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। তোমরা চাকরি করবে কেন, তোমরা হবে আমার পার্টনার, এক্সক্লুসিভ পার্টনার। তা তোমরা এখন চা খাবে তো?'

'সন্ধ্যার দিকে সবাই চা আর সিরাজের দোকানের পুরি খেয়েছি, এখন আর দরকার নেই।' পল্লব বলল।

'তো যা বলছিলাম। আমার দ্বিতীয় ব্যবসাটা হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধানমূলক ব্যবসা।'

'পরামর্শ কেন্দ্রর মতো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'কিছুটা, তবে পুরোপুরি পরামর্শমূলক নয়। যেমন কারো ডায়রিয়া হলো, দেশে তো অনেক ডাক্তার, কিন্তু কোন ডাক্তারটা ডায়রিয়া রোগের জন্য ভালো, তার অ্যাপায়রমেন্ট নেওয়া, তার চেম্বার কোথায় সে ঠিকানা জোগাড় করা; সব আমরা করে দেব। আবার ধরো কেউ নতুন করদাতা হলে কোন উকিল ধরলে ভালো হবে; কারো সন্তানের খতনা দিতে হবে, হাজাম কোথায় পাবে; পাত্র-পাত্রী জোগাড়; মোট কথা সব ধরনের কাজ করব আমরা।' কিছলু ভাই একটু থেমে বলেন, 'আমার তৃতীয় ব্যবসাটা হচ্ছে— ।'

'তার আগে আমার একটা কথা আছে।' পল্লব একটা হাত উঁচু করে বলে, 'যেসব দম্পতির বাচ্চাকাচ্চা হয় না, আপনি কি তাদের জন্যও কোনো ব্যবস্থা রাখবেন?

'তাদের জন্য ব্যবস্থা মানে?' কিছলু ভাই এবারও রেগে যেতে নিয়েই থেমে যান।

'না মানে অন্য কিছু না। এই যেমন ডিমপড়া হুজুরের মতো কোনো জায়গার কথা বলে দেবেন নাকি?'

'এটা একটা স্পর্শকাতর বিষয়, এটা নিয়ে এখনো ভাবিনি, পরে এটা নিয়ে ভাবব।' কিছলু ভাই আবার সোজা হয়ে বসে বলেন, 'আমার তৃতীয় ব্যবসাটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা। সবকিছু মিলিয়েই আমি ব্যবসাটা শুরু করতে যাচ্ছি, যাচ্ছি মানে কি অলরেডি শুরু করে দিয়েছি। অফিসের কলিগসহ বেশ

কয়েকজনকে বলেও দিয়েছি, আমার পক্ষ থেকে অন্যদেরও বলতে অনুরোধ করেছি তাদের।'

কথাটা শেষ করেই টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরান কিছলু ভাই। আমি অবাক হয়ে বলি, 'আপনি তো সিগারেট খান না কিছলু ভাই!'

'খেতাম না, এখন থেকে খেতে হবে, ব্যবসার স্বার্থেই খেতে হবে। ও, আরেকটা কথা, বিকেলে টেলিফোন সেটটা দেখে পল্লব কী একটা জিজ্ঞেস করেছিল। ব্যবসার জন্য শুধু মোবাইল ফোন হলেই চলবে না, টেলিফোন সেটেরও দরকার আছে। তাই তো সেটটা নিয়ে এলাম।'

'কিন্তু লাইন পাওয়া তো আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতো।'

'সে ঝামেলাটা এখানে নেই। আমাদের এ বিল্ডিংয়ের পাশের বিল্ডিংয়ের নিচে একটা টেলিফোনের দোকান আছে, তোমরা হয়তো দেখেছ। সেখান থেকে কীভাবে যেন লাইন দেয়। মাসে এর জন্য আমাকে দিতে হবে তিনশ টাকা। আর কল করলে তো কলের বিল দিতেই হবে। তবে এখানে একটা সুবিধা পেয়েছি আমি, আমার কোনো ক্লায়েন্ট এলে ওরা সেখান থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে আমাকে এখানে জানিয়ে দেবে, আমার এ চেম্বার দেখিয়ে দেবে, এর জন্য ওদের সামান্য কমিশনও দেব আমি। কাল ওখানে একটা সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।'

ছাদের দরজায় খট খট শব্দ হয়। কিছলু ভাই সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলেন, 'দেখো তো, কোনো ক্লায়েন্ট এলো কি না, তোমাদের একজন গিয়ে ডেকে নিয়ে আসো তাকে। আমি এর মধ্যে একটু প্রস্তুত হই।'

আমি নিজেই গিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসি। তবে তারা একজন না, দুজন। কিছলু ভাইয়ের ঘর-কাম-অফিসে ঢুকেই দেখি তিনি টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন আলাপে ব্যস্ত। তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে জরুরি কোনো আলাপ চলছে। আমাদের দেখেই লোক দুটোকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন হাত দিয়ে ইশারা করে, আর আমাদের বসতে বললেন বিছানায়।

পাক্কা পনেরো মিনিট চিঠি লেখা, পাত্র-পাত্রীর সন্ধান, ইন্স্যুরেন্স-সংক্রান্ত কথা শেষ করে লোক দুটোর দিকে ফিরলেন কিছলু ভাই, 'স্যরি, আপনারা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। কী করব বলুন, সারাক্ষণ শুধু ফোন আর ফোন।

একজনকে এ বিষয়ে জানাতে হয়, আরেকজনকে আরেক বিষয়ে জানাতে হয়, কত যে সমস্যা মানুষের! বলা যায় সারাক্ষণই ক্লায়েন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। যাক সেসব কথা। এবার বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি আমি।'

'না স্যার, আমাদের জন্য কিছু করতে হবে না।' দুজন একজন নড়েচড়ে বসে বলেন।

'কিছু করতে হবে না মানে!' কিছলু ভাই বেশ অবাক হয়ে বলেন, 'আপনারা তাহলে এসেছেন কেন?'

'আপনার টেলিফোনে তো এখনো সংযোগ দেওয়া হয় নাই, আমরা এসেছি সেই সংযোগ দিতে!'

চার দিন হয়ে গেল আজও বুয়া আসেনি। কথাটা শুনে কিছলু ভাই বললেন, 'ওই শালির জন্য আর অপেক্ষা করার দরকার নাই, তুমি আরেকটা বুয়ার খোঁজ করো অর্ণক।'

'আরেকটা বুয়া আমি কোথায় পাব কিছলু ভাই?'

'কোথায় পাবে মানে, আরে মিয়া ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় নাকি!' কিছলু ভাই কিছুটা রেগে গিয়ে বলেন।

'এটা আপনি কী বললেন কিছলু ভাই, কাক আর বুয়া এক হলো? আপনার নতুন কোম্পানির জন্য আপনি এক মিনিটের মধ্যে একশটা মাস্টার্স ডিগ্রির ছেলে পেতে পারেন, দু-এক ডজন এমবিএ ডিগ্রিধারী পেতে পারেন, এমনকি কয়েক হালি বেকার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারও পেতে পারেন, কিন্তু বুয়া পাবেন না।'

'আরে ভাই, তুমি আগেই হতাশ হচ্ছ কেন, আগে দু-একবার চেষ্টা করবে তো!'

'চেষ্টা তো এই প্রথম করব না, এর আগেও তো বুয়া রাখার ব্যাপারে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি।'

'আরো কয়েকবার করো। বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

'এখানে বিশ্বাসের কথা আসছে কেন?'

'আরে মিয়া, গাড়ির পেছনে লেখা দেখা না—হতাশ হয়ো না যদি তুমি মমিন হও। মুমিন মানে কী জানো তো?'

'জি জানি।'

'যাও, এবার মুমিন হয়ে চেষ্টা করো।'

এ বাসায় আসার পর আমরা এ পর্যন্ত চারটি বুয়া রেখেছি এবং বেশ মুমিন মানে বিশ্বাসী হয়েই রেখেছি। প্রথম বুয়াটা আমাদের বাসায়ই ঢুকল হাসি

হাসি মুখ করে। বলা যায় প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল তাকে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, তাকে যা-ই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন, সেটার উত্তর দেওয়ার আগে সে একবার হেসে নেবে, তা সে যত কঠিন প্রশ্নই হোক, রাগের প্রশ্নই হোক। কথাও বলত শুদ্ধ করে, রান্নাও বেশ ভালো ছিল তার। সবকিছু মিলিয়ে তার প্রতি আমাদের সবারই ভালো-লাগা জন্মে গিয়েছিল। তো একদিন আমরা খেয়াল করি তার মুখে কোনো হাসি নেই। আমাদের সবার সঙ্গে এ বুয়াটার সমানুপাতিক খাতির থাকলেও পল্লবের সঙ্গে একটু বেশি ছিল, সেটা পয়েন্ট শূন্য এক পার্সেন্ট হলেও বেশি ছিল। সদাহাস্যময় বুয়ার হঠাৎ এই হাসি বন্ধের কারণ অনুসন্ধান করতেই পল্লব একটু এগিয়ে বলল, 'কী গো খালা, মুখটা ব্যাজার ক্যা?'

বুয়া আঁচল টেনে নিয়ে বলে, 'না, কিছু না।'

'কিছু না তো মুখে হাসি কই?'

'আমার আর এখানে কাজ করতে ভালো লাগতেছে না।'

'কেন?'

'আপনেরা সবাই বাইরে থাকেন, আমার একা একা লাগে। আরো দুই বাসায় কাজ করি, ওইখানে টিভি আছে। আপনাদের নাই। টিভি-টুভি থাকলে নাহয় সেইটা দেখতে দেখতে কাজ করতাম। সবকিছু কেমন যেন বোর লাগে এইখানে।'

'বোর লাগে!' পল্লব বেশ কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলে বলে, 'ঠিক আছে, দেখি এই বোরিং কাটাতে কী করতে পারি আমরা।'

বুয়ার টেলিভিশন না থাকা বিষয়ক বোরিংয়ের কথা বলতেই কিছলু ভাই বেশ নরম স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা টেলিভিশন হলে খারাপ হয় না। সারা দিন অফিস-আদালত করি, তোমরাও পড়াশোনা করো, মাঝে মাঝে টিভি খুললে ভালোই লাগবে। বুয়া যখন বাসায় রান্না করতে আসে, সেও তখন একটু-আধটু দেখল, খারাপ কী?'

সর্বসম্মতিক্রমে সমান হারে চাঁদা দিয়ে একটা চৌদ্দ ইঞ্চি সাদা-কালো টিভি কিনে আনলেন একদিন কিছলু ভাই। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তার পরের দিন থেকে রান্নার মান দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো কোম্পানির শেয়ারের মতো হু হু করে পড়ে যেতে গেল। লবণ হয় তো ঝাল হয় না, ঝাল হয় তো লবণ হয় না। যখন হয় তখন এত বেশি হয়, মনে হয়, ও দুটো আমাদের কিনতে হয় না, এমনি এমনি বাতাস থেকে পাই আমরা।

বরাবরের মতো এবারও পল্লব এগিয়ে এলো, আমি আর রবি পাশে বসে থাকি। বুয়ার সঙ্গে টিভি দেখতে দেখতে সে হাসি হাসি মুখ করে কিছুটা ভয় ভয় গলায় বলল, 'খালা, একটা কথা বলব?'

বুয়ার চোখ টিভির দিকে, মনোযোগ দিয়ে সে টিভি দেখছে। পল্লবের কথা সে শুনতে পায় না কিংবা পেয়েও তেমন পাত্তা দেয় না—এ দুটোর কোনটা ঠিক বোঝা যায় না। পল্লব আবার হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'খালা, একটা কথা বলব?'

বুয়া টিভি থেকে চোখ না সরিয়ে বরং আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে বলে, 'হি হি..., আমাকে কিছু বললেন?'

'না, মানে আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।'

'হি হি..., প্রাইভেট কথা?'

'না না প্রাইভেট কথা না।'

বুয়া আগের মতোই টিভির দিকে মনোযাগ দিয়ে তাকিয়ে বলে, 'হি হি..., তাহলে?'

'রান্নার বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম আর-কি।'

'হি হি..., বলেন?'

'রান্নাটা ইদানীং কেমন যেন খারাপ হয়ে আসছে।' পল্লব আগের মতোই শঙ্কিত কণ্ঠে বলে।

বুয়া এবারও পল্লবের দিকে তাকায় না। টিভির দিকেই তাকিয়ে বলে, 'হি হি..., খারাপ হওয়ারই কথা।'

পল্লব চোখ দুটো সামান্য বড় করে বলে, 'কেন?'

বুয়া এবার হাসে না, কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি আর যে দুই বাসায় কাজ করি, তাদের রঙিন টিভি, দেখার মজাই আলাদা। টিভি দেইখা মজা পাই, রান্না কইরাও তাই মজা পাই, রান্নাও সে জন্য ভালো হয়। তা ছাড়া আপনাদের টিভিটাও একেবারে পিচ্চি। একদিকে টিভিটা ছোট, তার ওপর সে টিভিতে কোনো রঙ নাই, তাই মনেও রঙ পাই না। মনে রঙ না পাইলে রান্না কীভাবে ভালো হইব বলেন?' কথাটা শেষ করে বুয়া হাসতে থাকে, হি হি...।

'তার মানে রঙিন টিভি না হলে আপনার রান্না ভালো হবে না?'

'হি হি..., সরাসরি আমি কিছু বলতে চাই না, আপনেরা বুইঝা নেন।' বুয়া টিভি দেখতে থাকে মনোযোগ দিয়ে।

ঝাল লবণ না হোক, এর আগে খাবার তাও কোনোরকম মুখে দেওয়া

যেত। বুয়াকে কথাটা বলার পর সে যা রান্না করতে শুরু করল, তা মুখের ভেতর নেওয়া তো দূরের কথা, ঠোঁটও ছোঁয়ানো যায় না সেই খাবারে। অবস্থা চরমে উঠে গেল আমাদের। কিছলু ভাই একদিন অফিস থেকে ফিরে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বুয়াকে বললেন, 'ওই মাতারি, তুই এসব কী শুরু করছস?'

বুয়া কিছলু ভাইয়ের চেয়ে রেগে গিয়ে বলল, 'মুখ সামলায়া কথা বলেন, গালি দিয়া কথা কইবেন না, তুই-তোকারি করবেন না। আমি ভদ্রঘরের মাইয়া।'

'তোমাকে গালি দেব না তো কোলে নিয়ে বসে থাকব?'

কিছলু ভাইয়ের দিকে বুয়া এবার একটু এগিয়ে যায়। তারপর মুখটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বেশি ফাল পারলে কিন্তু গোপন কথা ফাঁস কইরা দিমু।'

চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলেন কিছলু ভাই, 'তুই কী গোপন কথা ফাঁস করবি রে শালি?'

'আমাকে যে কোলে নিয়া বইসা থাকার কথা প্রায় প্রতিদিনই ফিসফিস কইরা কইতেন, সেইটা কইয়া দিমু।'

অবস্থা জরুরি অবস্থার দিকে যাচ্ছে। আমি দ্রুত বুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আর একটা কথাও বলবেন না আপনি। আপনার যা পাওনা আছে নিয়ে যান, কাল থেকে আর আসতে হবে না আপনাকে।'

মাথা নিচু করে ফেলল বুয়া। আমাদের চারজনের মধ্যে কেবল আমাকেই একটু ভয় পেয়ে চলে বুয়া। তার কারণও আছে। বুয়া যে বস্তিতে থাকে, সে বস্তি আবার নিয়ন্ত্রণ করে আমার বন্ধুর এক বড় ভাই। বস্তির সামনে বড় ভাইয়ের সঙ্গে একদিন কথা বলতে দেখেছিল বুয়া আমাকে।

বুয়া থাকাতে আমাদের মধ্যে একটা আয়েশি ভাব এসে গিয়েছিল। রান্না থেকে শুরু করে ঘর ঝাড় দেওয়া, মুছে দেওয়া, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে দেওয়া, সবকিছুই সে করত, কিছুই করতে হতো না আমাদের। বুয়া চলে যাওয়ার পর আমরা পড়ে গেলাম বিপদে। ঘর ঝাড় দেওয়া, কাপড়-চোপড় ধোয়া, বিছানার চাদর টানটান করা নাহয় আমরাই করতে পারব, কিন্তু রান্না করাটা?

কিছলু ভাই একদিন সাহস করে বললেন, 'আজ থেকে আমিই রাঁধব, তোমরা শুধু আমাকে একটু সাহায্য কোরো।'

কিছলু ভাই রান্না করলেন, আমরা সাহায্য করলাম, তারপর সবাই মিলে

আনন্দ নিয়ে খেলাম। সত্যি করে বলছি, এত স্বাদের রান্না আমরা অনেক দিন খাইনি। তা দেখে কিছলু ভাই বেশ গর্ব নিয়ে বললেন, 'কী, কেমন রাঁধলাম?'

'অমৃত।' বলেই রবি আরেক প্লেট ভাত নিল।

আমার দিকে তাকালেন কিছলু ভাই, 'অর্ণক, তোমার কাছে কেমন লাগল বলো তো?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো!' কিছলু ভাই একটু শব্দ করে বললেন, 'আরে ভাই, প্রশংসা করতে হয় মন খুলে, মন খুলে প্রশংসা করতে শেখো অর্ণক।'

কিছলু ভাই এবার পল্লবের দিকে তাকালেন। পল্লব রেডিই ছিল, কিছলু ভাই কিছু বলার আগেই সে বলল, 'আসলে আমরা সবাই বাইরে থেকে এসে রান্না শুরু করেছি, রান্না করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাদের, ক্ষুধার্তও ছিলাম আমরা। পেটে ক্ষুধা থাকলে সবকিছুই ভালো লাগে।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ রান্না ভালো হয় নাই?' কিছলু ভাই চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন।

'আমি ঠিক তা বলছি না।'

'তুমি মিয়া আসলেই একটা খাট্টাশ। তোমার মধ্যেও প্রবলেম আছে। সবার মধ্যেই প্রবলেম থাকে, তোমার মধ্যে খুব বেশি। মিয়া, একদিন রান্না করে খাওয়াই তো দেখি। দেখব! কী চ্যাট রাঁধো!'

মাত্র দুই ঘণ্টা। কিছলু ভাইয়ের অসাধারণ রান্না, যা রবির কাছে অমৃতের মতো লেগেছিল, সেই অমৃতের রিঅ্যাকশন শুরু হলো প্রথমে রবির মাধ্যমেই। তারপর যথাক্রমে কিছলু ভাই, আমার এবং পল্লবের মাঝে।

রবির মাঝে যেহেতু প্রথম শুরু হয়েছিল, সুতরাং আমাদের একমাত্র টয়লেটটা প্রথম দখল করল রবিই। কিন্তু ও সেই জায়গাটা এমনভাবে দখল করে রাখল, যেন আমাদের ওই নিত্যপ্রয়োজনীয় জায়গাটা ও পৈতৃক সূত্রে পেয়েছে। কিছলু ভাই শেষে বেশ চাপা গলায় বললেন, 'রবি, আর কতক্ষণ?'

রবিও টয়লেটের ভেতর থেকে চাপা গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না কিছলু ভাই।'

আরো একটু অপেক্ষা করে কিছলু ভাই বেশ বিরক্ত হয়ে চেহারা কাঁচুমাচু করে একটা পেপার হাতে নিয়ে ছাদে পানির ট্যাঙ্কের পাশে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তৃপ্তিময় চেহারা নিয়ে তিনি ফিরে আসতেই পল্লবও আরেকটা পেপার হাতে নিয়ে কিছুটা দৌড়ে চলে গেল সেই ট্যাঙ্কের পাশে। ঠিক তখনই

রবি বের হয়ে এলো টয়লেট থেকে। আমি যেই না টয়লেটে ঢুকতে যাব, ও তখন হাসতে হাসতে বলল, 'পানি নাই কিন্তু।'

ওর কথা এ-কান দিয়ে ঢুকিয়ে ও-কান দিয়ে বের করার আগেই আমি আমার ভেতরের সবকিছু বের করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। অনেক দিন পর গোপাল ভাঁড়ের সেই গল্পটা মনে পড়ল—রাজার সন্তান হওয়াতে সে বলেছিল, সে নাকি বাথরুম করার মতো আনন্দ পেয়েছে! সত্যি, ত্যাগের সুখই হচ্ছে মহাসুখ, তা সে যে ত্যাগই হোক না কেন।

চারজন ভারমুক্ত হয়ে, স্থির হয়ে বসে, অনেক আলোচনা পর্যালেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম—না, বুয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। বুয়া আমাদের লাগবেই।

দুই দিন পর আরেকটা বুয়া ঠিক করে ফেললাম আমরা। এ বুয়াটা কথায় কথায় হাসে না, কথাও বলে কম। তবে এ বুয়ার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিদিন আসার সময় একটা চটের ব্যাগ সঙ্গে করে নিয়ে আসে, কিছুটা মতিঝিলে খাবারের ব্যাগ নিয়ে অফিস করা অফিসারদের মতো।

রান্না বেশ ভালোই করছিল বুয়াটা। কিন্তু সমস্যা হলো অন্য এক জায়গায়। সপ্তাহে আমরা আগে যে পরিমাণ চাল কিনতাম, তেল কিনতাম, তরিতরকারি কিনতাম, এখনো তা-ই কিনি। তবে সেসব জিনিস দিয়ে আগে যে কদিন যেত, এখন যায় দু-এক দিন কম। ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে প্রথম টের পেল রবি, কারণ আমাদের চারজনের সংসারের সাংসারিক হিসাবটা ওকেই রাখতে হয়। কথাটা শুনে কিছলু ভাই খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'সব শালির মধ্যেই দেখি সমস্যা। অর্ণক, তুমি ওকে বলবে কাল থেকে আসার সময় যেন ওই চটের ব্যাগটা সঙ্গে করে নিয়ে না আসে।'

'বুয়া যদি বলে, কেন নিয়ে আসবে না? আমি তখন কী বলব?'

'কিছু একটা বলে ম্যানেজ করে নিয়ো।'

'আপনার কি মনে হয় কিছু একটা বললেই সবকিছু ম্যানেজ হয়ে যাবে?' কিছলু ভাইয়ের দিকে তাকাই আমি।

'আরে ভাই, একবার চেষ্টা করে দেখোই না।'

আমাদের কাউকেই কোনোরকম চেষ্টা করতে হলো না। সিদ্ধান্তহীন ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠানের মতো আমাদের প্রতিদিনের ফিসফিসানি টের পেয়ে বুয়া বাসায় চটের ব্যাগ আনা বন্ধ করে দিল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা। কিন্তু চার দিন পর বুয়া এলো একবারে ইসলামিক কায়দায়। হাত-পায়ে মোজা, সারা শরীরে কালো কাপড়ের বোরকা, মুখটাও একটা ওড়নার মতো কাপড়

দিয়ে ঢাকা, শুধু চোখ দুটো বের করা।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি আমরা, এমন সময় বুয়া নিজে এসেই বলল, 'ভাইজান, জীবনে অনেক ভুলত্রুটি করছি, আর ভুল করতে চাই না। গতকাল এক পীরের মুরিদ হইছি, তিনিই আমাকে এইভাবে পর্দা কইরা চলতে বলছেন।'

আমরা আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

চার থেকে পাঁচ দিন ভালোই ছিল, কিন্তু তার পর থেকেই রবি টের পেল আমাদের সংসার থেকে জিনিসপত্র আবার পাচার হওয়া শুরু হয়েছে। কথাটা আমাদের বলতেই কিছলু ভাই আগের মতোই ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তোমরা কেউ আজ কোথাও যাবে না, আমিও অফিসে যাব না। আমাদের বাসার আশপাশেই থাকব আমরা। বুয়া দুপুরে এসে রান্না করে যখন চলে যাবে, তার আগেই আমরা বাসায় ফিরে আসব।'

পল্লব বলল, 'কেন?'

পল্লবের দিকে তাকিয়ে কিছলু ভাই বললেন, 'কাজ আছে।'

'কিন্তু আমার তো একটা জরুরি কাজ আছে কিছলু ভাই।'

কিছলু ভাই ছাদের দিকে যাচ্ছিলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। পল্লবের দিকে একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'শোনো মিয়া, জরুরি কাজ শুধু তোমার নেই, এ দুনিয়ায় অনেক মানুষের অনেক জরুরি কাজ আছে। কিন্তু তারা তোমার মতো বলে বেড়ায় না—জরুরি কাজ আছে আমার, জরুরি কাজ আছে আমার।'

পল্লব কী একটা বলতে নেয়, কিন্তু তার আগেই আমি ওকে হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে আসি। রবিও আমাদের সঙ্গে আসে। শুধু কিছলু ভাই ছাদের দিকে পা বাড়ায়।

বাসার পাশের একটা চায়ের দোকানে অপেক্ষা করার পর বুয়া চলে যাওয়ার আগেই বাসায় ফিরে আসি আমরা। আমাদের দেখে বুয়া তেমন চমকায় না, কেবল একটু অবাক স্বরে বলে, 'আজ চারজনই একসঙ্গে বাসায় আসলেন যে?'

কিছলু ভাই রেগেই ছিলেন। তিনি আরো একটু রেগে গিয়ে বললেন, 'আপনার কোনো অসুবিধা আছে তাতে?'

'না, অসুবিধা থাকব ক্যান?'

'ভালো, অসুবিধা না থাকলেই ভালো। তো এখন একটা কাজ করেন তো দেখি। আপনার বোরকাটা খোলেন।'

'কী!' বুয়া চমকে উঠে বলে।

'কানে নিশ্চয় কম শোনেন না আপনি?'

'বোরকা খুলুম ক্যান আমি? বোরকা খোলা আমার পীরসাহেবের নিষেধ আছে।'

'গোসল করার সময়ও কি খুলতে নিষেধ আছে?'

'না।'

'তাহলে খোলেন।'

'আমি কি এখন গোসল করতেছি নাকি যে খুলুম!'

'আপনাকে আমরা গোসল করাব।' কিছলু ভাই একটু সোজা হয়ে বসে বলেন।

'এইটা আপনি কী বলতেছেন?'

'কী বলছি বুঝতে পারছেন না? শোনেন, এত নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আপনি নিজেই যদি বোরকাটা না খোলেন তাহলে আমরা নিজেরাও খুলব না। আমি শুধু একটা ফোন করব, আমার এক পুলিশ বন্ধু আছে, ওকে সব বলেছি আমি, ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে এখানে, তারপর ও নিজ হাতে আপনার বোরকা খুলবে।'

'উনি আইসা ক্যান আমার বোরকা খুলব?' বুয়া কান্না কান্না গলায় কিছুটা শব্দ করে বলে।

'কারণ আপনার বোরকার নিচে যে অনেকগুলো পকেট আছে, সেই পকেটগুলো দেখবে ও।'

বুয়া আর কিছু বলে না। বোরকাটা খুলে কিছলু ভাইয়ের হাতে দেয়। কিছুল ভাই বোরকাটা উল্টিয়ে আমাদের সামনে মেলে ধরেন। আমরা অবাক হয়ে দেখি, বোরকার উল্টোপাশে সাত-আটটা কালো কাপড় দিয়ে পকেট বানানো। কিছলু ভাই আমাদের আরো অবাক করে দিয়ে এক পকেট থেকে বের করেন দুটো পেঁয়াজ, আরেক পকেট থেকে বের করেন তিনটা আলু, নিচের একটা থেকে বের করেন ছোট্ট একটা তেলের শিশি।

বোরকাটা ফেরত দিয়ে কিছুই বলিনি আমরা বুয়াকে। কিন্তু পরদিন থেকে বুয়া আর আসেনি।

যথারীতি বুয়াবিহীন সময়ে আবার রান্নার দায়িত্ব নিলেন কিছলু ভাই। অতীত অভিজ্ঞতায় তিনি এবার ভাতের সঙ্গে ডাল আর আলুভর্তাতেই সীমাবদ্ধ রইলেন, অন্য কিছুতে যাওয়ার সাহস পেলেন না। এরই মধ্যে এক রাতে তিনি

রান্না করছিলেন। আমরা পাশের ঘরে টিভি দেখছিলাম। হঠাৎ তিনি আমাদের রুমে এসে বললেন, 'ডালটা হয়ে এসেছে, নামানোর আগে এক চামচ লবণ দিতে হবে। আমি একটু জরুরি ভিত্তিতে টয়লেটে যাচ্ছি, তোমরা কেউ একজন দু-তিন মিনিট পর এক চামচ লবণ দিয়ে এসো তো ডালে। টয়লেট থেকে বের হয়ে তারপর ডালটা নামাব আমি।' ছাদে কে যেন এসেছিল তা দেখতে গিয়ে রবি এক চামচ লবণ দিয়ে এসেছিল ডালে, কিন্তু রুমে এসে আমাদের তা বলেনি। পানি খেতে গিয়ে পল্লবও আরেক চামচ লবণ দিয়ে আসে ডালে, সেও এসে কিছু বলেনি। শেষে দায়িত্ব মনে করে আমিও গিয়ে এক চামচ লবণ দিয়ে এসেছিলাম ডালে। তারপর খেতে বসেই সবকিছু ফাঁস হয়ে যায়। কিছলু ভাই রেগে গিয়ে বলেন, 'তোমাদের কোনো কিছু বলে মজা নাই। বলি একটা করো আরেকটা। যাও, কাল থেকে আমি আর রান্না করব না। আরেকটা বুয়া ঠিক করো।'

আরেকটা বুয়া ঠিক করলাম আমরা। তবে বুয়া একটা শর্ত দিল আমাদের—তাকে আম্মা বলে ডাকতে হবে। শুনে কিছলু ভাই বললেন, 'এটা কী বললেন আপনি! শাশুড়িকে আম্মা ডাকতে হবে বলে বিয়ে করছি না, আর আপনাকে ডাকতে হবে আম্মা!'

'আম্মা কয়া না ডাইকা অন্য নামে ডাকলে আমি থাকমু না।'

কিছলু ভাইকে ইশারা করে বুঝে দিলাম কথা না বাড়াতে। পরে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, 'তাকে আম্মা বলে না ডাকতে চান ডাকবেন না। তাকে ডাকতেই হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি!'

'অন্যভাবেও তো ডাকা যাবে না।'

'অন্যভাবেও ডাকতে হবে না আপনাকে।'

'তো?'

'আকারে-ইঙ্গিতে ডাকবেন, কখনো প্রয়োজন হলে—এই যে, শুনছেন, এদিকে একটু আসেন—এভাবে ডাকবেন।'

ডাকাডাকি কিংবা সম্বোধনের ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। কিন্তু মুশকিল হলো দুটো বিষয়ে। এক. বুয়া শুধু রান্নাই করে না, আমাদের সামনে বসে থাকে, যতক্ষণ না আমরা খাওয়া শেষ করি। মাঝে মাঝে অনেক রাতে খাওয়া শেষ হয় আমাদের, সে ওই সময় পর্যন্তও বসে থাকে আমাদের সামনে। তারপর এত রাতে বাসায় যাবে কীভাবে সে, আমাদেরই কাউকে না কাউকে পৌঁছে দিতে হয়। দুই. মাঝে মাঝে তার বাসা থেকে এটা-ওটা রান্না করে আনে, যা দেখলে

অরুচি তো বেড়েই যায়, পেটও আপনা-আপনি কুঁ কুঁ করে প্রতিবাদ জানায়। তার রান্না করা জিনিসগুলো আবার খেতে হবে তার সামনে বসেই।

রবি একদিন তা খেয়ে এমন বমি করা শুরু করল, সেই বমি আর থামে না। একটু পর শুরু হলো খিঁচুনি। শেষে ডাক্তার ডেকে আনা হয়। পুরো পাঁচ দিন পর রবি বিছানা থেকে উঠে বসে এবং তার পরদিনই আমাদের এ নয়া আম্মাকে বিদায় জানানো হয়।

আমাদের বর্তমান অর্থাৎ চার নম্বর বুয়ার অন্য কোনো দোষ নেই, একটাই দোষ—হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয়ে যায় সে। দু দিন পর এসে মরা কান্না জুড়ে দিয়ে বলে—'জ্বরে মইরা গেছিলাম ভাই গো, পেটের ব্যথায় মাটিতে শুধু গড়াগড়ি খাইছি এই কয়দিন, মাথাটা এমন ধরা ধরছিল মনে হইছে ট্রাকের নিচে মাথাটা ঠেইলা দেই।'

দু দিন পর ফিরে এলেও এবার চার দিন হয়ে গেছে কিন্তু বুয়ার পাত্তা নেই। কিছলু ভাই তো অফিসে যাওয়ার সময় বলেই গেলেন আর অপেক্ষা না করতে, আরেকটা বুয়া খোঁজ করতে। কিন্তু তার আগে এটা জানা দরকার, মহিলার হলোটা কী। কোনো জটিল সমস্যা না তো? রবি আর পল্লব আগেই বের হয়ে গেছে রুম থেকে, অগত্যা খোঁজ নিতে হবে আমাকেই।

রুম থেকে বের হয়ে ছাদে পা রাখতেই দেখি বাড়িওয়ালা ছাদে এসে কী যেন করছেন। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'সকাল নাই বিকাল নাই পাড়ার ছেলেদের শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট খেলা।' হাত বাড়িয়ে একটা ক্রিকেট বল দেখিয়ে বললেন, 'এই যে দেখেছ, একটা বল এসে পড়েছে ছাদে। তারপর আমাকে এসে বলে কিনা বলটা এনে দিতে। আমার মেয়েরা ছাদে বেড়াতে আসে, যদি ওদের কারো মাথায় লাগত বলটা, তাহলে কী হতো বুঝতে পারছ?'

'কী আর হতো, বেশি কিছু হলে মরে যেত।'

'হ্যাঁ, যে শক্ত বল, মরে যেতেই পারত।'

'আপনার তো তিনটা মেয়ে, একটা মরে গেলে তো আরো দুটা থাকত। অসুবিধা নাই। আপনি বরং বলটা ওদের ফেরত দিন, কারণ ওদের তো একটাই বল।'

রাগে গরগর করতে করতে বলটা হাতে নিয়ে চলে গেলেন বাড়িওয়ালা। কিছুক্ষণ পর শিমু এসে উপস্থিত, 'বাবার সঙ্গে আপনার কিছু হয়েছে নাকি?'

'না তো!'

'তাহলে ছাদ থেকে এত রাগ করে বাসায় ফিরলেন কেন বাবা?'

'অ, ছাদে কাদের যেন একটা ক্রিকেট বল এসে পড়েছিল?'

'সেটা তো বাবা আগেই জানেন। তখনো রেগে গিয়েছিলেন, তবে অল্প, কিন্তু ছাদ থেকে বাসায় ফিরলেন প্রচণ্ড রাগ করে।'

'আপনার বাবা এখন কোথায়?'

'বাজারে গেছেন।'

'মা?'

'রান্নাঘরে।'

'দুজনই ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ, দুজনই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন।'

'তার পরও বলুন তো, সংসারে সবচেয়ে বেশি কাজ কে করে—স্বামী, না স্ত্রী?'

শিমু একটু ভেবে বলে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'স্বামী বা স্ত্রী কেউই না, সবচেয়ে বেশি কাজ করে কাজের বুয়া।'

বাসার সামনে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে, সেখানে বসে আছেন আমাদের বাড়িওয়ালা। তার এই বসে থাকার কারণটা হচ্ছে, এখানে আর কাউকে খেলতে দেবেন না তিনি। সকালে ক্রিকেট বলটা ফেরত দিয়েছিলেন, তারপর ছেলেরা আবার খেলতে শুরু করে এবং একটু পর চারতলার জানালার কাচ ভেঙে ফেলে তারা সেই ক্রিকেট বল দিয়েই।

বিকেল হয়ে গেছে, বাসার বাইরে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম। কিন্তু দোতলায় নামতেই দেখি দরজাটা খোলা, শিমু দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মেয়েদের এই একটা গুণ দিয়েছে স্রষ্টা, যে ছেলের দিকে একবার নজর দেয় তারা, সবকিছু মুখস্থ করে ফেলে তার। ছেলেটা কখন কোথায় যায়, সাধারণত কোন রঙের শার্ট পরে, চোখে চশমা পরে কি পরে না, স-ব জেনে ফেলে নিমেশেই। আমি যে ইদানীং এই সময়টাতে নিচে নেমে বাসার সামনের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করি, শিমুও সেটা মুখস্থ করে ফেলেছে। আমাকে দেখেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শেষে বলল, 'বাবা ভীষণ রেগে আছেন। প্লিজ, উল্টাপাল্টা কিছু বলে আরো রাগিয়ে দেবেন না।'

অবাক হওয়ার ভান করে আমি শিমুর চোখ বরাবর তাকিয়ে বললাম, 'আমি কি উল্টাপাল্টা কিছু বলি?'

'জি বলেন। দু দিন কথা বলেছি তো আপনার সঙ্গে, আমি জানি কীভাবে কথা বলেন আপনি।'

'মাত্র দু দিন কথা বলেই জেনে গেছেন কীভাবে কথা বলি আমি!'

'মানুষকে জানার জন্য দু দিন কেন, দু ঘণ্টাই যথেষ্ট।'

'তাই?'

'আচ্ছা, আপনাদের বাসার বুয়া চলে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, চার দিন ধরে উধাও।'

'রান্নাবান্না চলে কীভাবে?'

'চলে যাচ্ছে আর-কি।'

'আরেকটা বুয়ার খোঁজ নিয়েছেন?'

'নিয়েছি, তবে পাব বলে মনে হয় না। আপনার কাছে কোনো বুয়ার খোঁজ আছে নাকি?'

'আছে। তবে তাকে পার্মানেন্টলি রাখতে হবে।'

'মানে?'

'মানে-টানে কিছু না, আপনি এখন যান।' দরজা বন্ধ করে দেয় শিমু। আমি তবু দাঁড়িয়ে থাকি সেখানে। মাথার ভেতর এ মুহূর্তে কিছু ঢুকছে না।

বাসার বাইরে পা রাখার আগে চেহারায় যতটা সম্ভব গোবেচারার ভাব এনে ফেলি আমি। তারপর বাইরে পা দিয়েই বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে সপ্তম আশ্চর্য দেখার মতো অবাক হয়ে বলি, 'আঙ্কেল, কী ব্যাপার, আপনি এখানে!'

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলেন না বাড়িওয়ালা। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, 'কোনো প্রবলেম, আঙ্কেল?'

কিছুটা খেঁকিয়ে ওঠার মতো করে উঠে বাড়িওয়ালা বলেন, 'সকালে তো খুব দিলদরিয়া হয়ে বললে বলটা ফেরত দিতে। তোমার কথা শুনে দিলামও। তার পরই তো চারতলার কাচটা ভেঙে দিল।'

'তাই নাকি! কাচ ভেঙে ফেলেছে, তাহলে তো খুবই খারাপ কাজ করেছে ওরা।' আমি একটু থেমে বলি, 'কিন্তু ওরা তো অন্য কিছুও ভেঙে ফেলতে পারত।'

'অন্য কিছু ভেঙে ফেলতে পারত মানে?' বাড়িওয়ালা আগের মতোই খেঁকিয়ে ওঠেন।

'এই ধরুন ক্রিকেট বলটা চারতলার জানালায় না লেগে দোতলার জানালায় লাগল এবং সেটা কাচ ভেদ করে সোজা আপনার মাথায় লাগল, তারপর আপনার মাথাটা ফেটেও গেল। ভেবে দেখুন, এতে আপনার খরচ করতে হতো দু জায়গায়। এক. জানালায় নতুন কাচ লাগাতে হতো, দুই. আপনার মাথা ঠিক করার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হতো।'

'আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারো তুমি, না? মিয়া, ভেবেছ এত বড় বাড়ি করে বেশ সুখে আছি। বাড়ি মেইনটেইন করার চিন্তায় সবকিছু আজকাল ডবল ডবল দেখি।'

'এটা কোনো সমস্যাই না। যখন কোনো কিছু ডবল দেখবেন তখন এক

চোখ বন্ধ করে রাখলেই একটা করে দেখতে পাবেন।'

বাড়িওয়ালা আমার দিকে গরম চোখে তাকালেন, কিন্তু আমি তাকালাম তিনতলার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাত করে উঠল বুকের ভেতরটা। হ্যাঁ, তিনতলার জানালাটা খোলা এবং সেই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুহিনা। রুহিনা এতক্ষণ আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল, কিন্তু আমি তার দিকে তাকাতেই সে অন্য দিকে তাকাল, তারপর বন্ধ করে দিল জানালাটা।

ব্যাপারটা নিয়ে আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। আজই একটা চিঠি লিখিয়ে নিতে হবে কিছলু ভাইকে দিয়ে। কথাটা তাকে বলতেই চিৎকার করে উঠে তিনি বললেন, 'কী বললে তুমি?'

'একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।'

কিছলু ভাই আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখেন আমার চেহারায়। তারপর ফোঁত করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'অর্ণক, তুমিও!'

'কেন কিছলু ভাই, আমার জীবনে কি প্রেম আসতে পারে না?'

আবার আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছলু ভাই। শেষে আরেকবার ফোঁত করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'বলো, মেয়ের নাম কী?'

'নাম না লিখলেও চলবে। আপনি একটা কিছু সম্বোধন করে শুরু করে দেন।'

'কী সম্বোধন দিয়ে শুরু করব?'

'সেটা যদি আমি জানতাম তাহলে আপনার কাছে আসি কেন কিছলু ভাই? আপনি তো এ বিষয়ে জ্ঞানের সাগর, আপনার জ্ঞানের কাছে আমি ছোট খাটো পুকুরও না, এক গ্লাস পানি।'

কিছলু ভাই তার বেডরুম-কাম-অফিসের টেবিলে বসে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'যাও, আশা রাখি কাজ হয়ে যাবে।'

চিঠিটা না পড়েই আমি আমার পকেট থেকে এক শ টাকা বের করে কিছলু ভাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'আমার সঙ্গেও ফাজলামো করো তুমি, না?'

'এটা ফাজলামো ভাবছেন কেন আপনি কিছলু ভাই? এটা তো আপনার ব্যবসা। যার জন্য আপনি নতুন চেয়ার-টেবিল সাজিয়েছেন, টেলিফোন

এনেছেন, বাইরে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডও টাঙিয়েছেন।'

'তাতে কী?'

'না মানে, ব্যবসা তো ব্যবসাই।'

কিছলু ভাই কী যেন ভাবলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বললেন, 'যাও, তোমার জন্য ফিফটি পার্সেন্ট কনশেসন। রবি, পল্লবের জন্য এ রকম কনশেসন থাকবে।' বাকি পঞ্চাশ টাকা আমাকে ফেরত দিলেন কিছলু ভাই। আমার রুমে এসে চিঠিটা পড়তে লাগলাম আমি।

> প্রিয় কাব্যলক্ষ্মী রুহিনা
> যখনই তোমার মুখখানা দেখি তখনই বুক ফেটে বেরিয়ে আসে I love you। এমনকি তোমার মুখখানা চোখে ভেসে উঠলেও বেরিয়ে আসে I love you। কিন্তু ফুল হাতে নিয়ে মুখফুটে কথাটা বলতে পারি না বলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো প্রাণপ্রিয়তমা। চাঁদের কণা, ইচ্ছে করে বুক চিড়ে দেখাই আমার বুকের মাঝে বাঁধানো তোমার ছবিখানা, দেয়ালে টাঙানো কোনো কারিনা, রানী, প্রীতি জিনতার ছবি না, কেবল তোমার ছবি। রক্তের ফ্রেমে বাঁধা হৃদয়ের কাছে দেখবে তোমার শুভ্র মুখখানা।
> ইতি তোমার ভাবনায় পাগল প্রায় অর্ণক আহমেদ

চিঠিটা পড়ে পরপর তিনবার চুম খেলাম। প্রথমবার চুম খেতে যতটুকু সময় নিলাম, দ্বিতীয়বার নিলাম তার দ্বিগুণ, তৃতীয়বার নিলাম তারও দ্বিগুণ। তারপর সেটা ভাঁজ করে চুমু খেলাম আরো তিনবার। চিঠিটা এখন রুহিনার হাতে পৌঁছানো দরকার।

তিনতলায় এসে দরজায় সামনে দাঁড়াতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল আমার। শরীরটাও কেমন যেন কাঁপতে শুরু করল। সেই কাঁপা কাঁপা হাত নিয়ে কলবেলটা টিপতেই দরজা খুলে দিল স্বয়ং রুহিনা। আয়নায় না তাকিয়েও আমি টের পেলাম মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আমার, জিভটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু ভিজে যাচ্ছে কপালের চারপাশটা। রুহিনা বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কেউ তো নেই বাসায়।'

'আঙ্কেল-আন্টি?'

'আঙ্কেল-আন্টি-লোপা-রন্টু কেউ নেই।'

'কোথায় গেছেন তারা?'

'তা জেনে আপনার দরকার কী? বাসায় নেই ব্যস।'

আমি কিছুটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলি, 'একটা চিঠি ছিল।'

'চিঠি! কার চিঠি?'

'রন্টুর।'

'রন্টু এলে রন্টুর হাতে দিয়েন।'

'না, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি তো। কখন আবার বাসায় ফিরি ঠিক নেই, কিন্তু চিঠিটা ওর হাতে একটু দ্রুত পৌঁছানো দরকার।'

বেশ দ্বিধা নিয়ে চিঠিটা হাতে নিল রুহিনা। আমি দ্রুত নিচের দিকে নেমে এলাম। আমি জানি, রন্টুর চিঠি তো, রুহিনা সেটা খুলে দেখবেই। কিন্তু খুলেই দেখবে তার নিজের চিঠি। প্রচণ্ড শব্দ করে হাসতে ইচ্ছে করছে আমার।

আধঘণ্টার মতো বাইরে এদিক-সেদিক ঘুরে বাসার সামনে আসতেই দেখি তিনতলার জানালাটা খোলা। এত রাত করে তো জানালাটা খোলা থাকে না! অন্ধকারও সেখানে, তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিছুটা শঙ্কিত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে তিনতলার কাছে আসতেই দরজাটা খুলে গেল, ভাঁজ করা একটা কাগজ এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে, তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

বাসায় এসেই রুদ্ধশ্বাসে বাথরুমে ঢুকে ভাঁজ করা কাগজটা খুললাম। কিছুই লেখা নেই কাগজে, কেবল মাঝখানে বড় করে লেখা আছে—মিস্টার ৪২০, ভালো হয়ে যান। জানেন তো, ভালো হতে পয়সা লাগে না।

দু চোখই অন্ধকার হয়ে এলো আমার। সেই অন্ধকার চোখ নিয়ে কাগজটা নেড়েচেড়ে দেখতেই টের পেলাম, কাগজের অপর পাশে আমার লেখা চিঠিটা। তার মানে আমার লেখা কাগজের অপর পাশেই চিঠির উত্তরটা দিয়েছে রুহিনা। আমার জন্য হৃদয়ের এক টুকরো মহব্বত তো দূরের কথা, করুণা তো দূরের কথা, এক টুকরো কাগজও ব্যয় করেনি সে!

ভীষণ শব্দ করে টেলিফোনটা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় আমার। এত সকালে আবার টেলিফোন করল কে?

টেলিফোনটা হয়েছে নতুন আরেক যন্ত্রণা। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ হঠাৎ বেজে ওঠে সেটা। কিন্তু যখন রিসিভ করা হয় তখন দেখা যায় কেউ কোনো কথা বলছে না। সবচেয়ে বিরক্ত লাগে, যখন মাঝরাতের দিকে টেলিফোনটা বেজে ওঠে। কিছলু ভাইয়ের টেলিফোন, কিছলু ভাইয়ের রুমে থাকে সেটা, অথচ রিসিভ করতে হয় আমাদের। কারণ একবার ঘুমিয়ে পড়লে কিছলু ভাইকে জাগানোর সাধ্য কারো নেই, এমনকি তার মাথার পাশে যদি একটি পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়, আমাদের বিশ্বাস এতেও জেগে উঠবেন না তিনি।

মাঝরাতে টেলিফোন রিসিভ করার অনেকগুলো যন্ত্রণা আছে। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ফোন রিসিভ করতে হয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ কথা বলছে না। আরেকটা যন্ত্রণা হচ্ছে কিছলু ভাই। ঘুমিয়ে পড়লে তিনি যেমন জাগতিক সব ব্যাপার থেকে দূরে থাকেন, তেমনি তার কাছেরও অনেক কিছু তার কাছ থেকে দূরে থাকে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিয়ম মেনে চলে তার পরনের লুঙ্গিটা। মাথার বালিশটা পায়ের কাছে কিংবা খাটের নিচে পড়ে থাকলেও, লুঙ্গিটা থাকে অদ্ভুত এক জায়গায়, আর সে জায়গাটা হলো তার মাথা। আমরা কেউই ভেবে পাই না শরীরের নিচের অংশের একটা বস্ত্র কীভাবে মাথায় উঠে আসে এবং সেটা আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে থাকে সেখানে।

আরেকটা যন্ত্রণা হচ্ছে, টেলিফোন রিসিভ করতে এসে ঘরের লাইটটা অবশ্যই জ্বালাতে হয়, আর লাইটটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো আপনা-আপনি চলে যায় কিছলু ভাইয়ের দিকে। আমরা যতই চেষ্টা করি চোখ দুটো ফিরিয়ে রাখতে, কিন্তু কীভাবে যেন চোখ দুটো সেদিকেই চলে যায়। অন্যদিকে

তাকিয়ে হ্যালো হ্যালো করলেও একসময় খেয়াল করি, আমরা কখন যেন কিছলু ভাইয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছি এবং প্রায় দিনই কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মানুষটাকে, যিনি কাপড় আবিষ্কার করেছেন, মানুষের জামা-কাপড় আবিষ্কার করেছেন। নাইলে প্রতিদিন আমাদের হাজার হাজার লাখ লাখ কাপড়হীন মানুষ দেখতে হতো, পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত দৃশ্য বস্ত্রহীন মানুষকে দেখতে হতো!

পরশু মাঝরাতের দিকে একটা টেলিফোন এসেছিল। আমার আর পল্লবের প্রবল চাপে রবি সেটা রিসিভ করতে যায় এবং একটু দেরি করেই ফিরে আসে। কে ফোন করেছিল, কাকে ফোন করেছিল ঘুমের কারণে তা জিজ্ঞেস করা হয় না রবিকে। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙে কিছলু ভাইয়ের চিৎকারে।

পল্লব বেশ বিরক্ত হয়ে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলে, 'এত চিৎকার করছেন কেন কিছলু ভাই?'

কিছলু ভাই আগের মতোই শব্দ করে বললেন, 'রাতে আমার রুমে গিয়েছিল কে?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে সেটা পরে বলছি, আগে বলো কে গিয়েছিল?'

পল্লব বিছানা থেকে উঠে বসে, আমিও। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠি আমি। কিছলু ভাই লুঙ্গির পরিবর্তে বিছানার চাদরটা পরে আছেন। আমি একটু শঙ্কিত হয়ে বলি, 'কোনো প্রবলেম কিছলু ভাই?'

'প্রবলেম না হলে এত সকালে তোমাদের সঙ্গে কেউ ঘেউ ঘেউ করতে আসে?'

'কী হয়েছে বলবেন তো?'

'তার আগে তোমাদের বলতে বললাম না, রাতে আমার ঘরে কে গিয়েছিল?' কিছলু ভাই এবার একটু শব্দ করে বলেন।

'রাতে আপনার টেলিফোনে প্রায় এক ডজনের মতো ফোন আসে। আপনি তো তার একটুও টের পান না। আপনার রুমে গিয়ে ফোনগুলো আমাদেরই কাউকে না কাউকে রিসিভ করতে হয়।'

'তোমাদের কি আমি বলেছি ফোন রিসিভ করতে?'

'তা বলেননি।'

'তো?'

আমি কিছু বলার আগেই পল্লব কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'তো মানে কী? ঘুমিয়ে পড়লে তো আপনার হুঁশ থাকে না, মরার মতো পড়ে থাকেন আপনি।

কিন্তু টেলিফোন এলে সেটা রিসিভ না করা পর্যন্ত একনাগাড়ে বিকট শব্দে বাজতেই থাকে, এতে তো আমাদের ঘুম একেবারে হারাম হয়ে যায়।'

'কাল থেকে তোমরা কেউ আমার ঘরে যাবে না, ফোনও রিসিভ করবে না।'

'কিন্তু ফোন এসে যে চেঁচাতে থাকবে সেটা থামাবে কে?'

'আমি থামাব।' বলেই কিছলু ভাই তার রুমে চলে যান। একটু পর আমি আর পল্লব কিছলু ভাইয়ের রুমে গিয়ে দেখি খাটের ওপর চুপচাপ বসে আছেন তিনি। মনটা খারাপ হয়ে যায় আমাদের, হাজার হলেও তিনি বড় ভাইয়ের মতো। আমি তার একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'স্যরি কিছলু ভাই, কী হয়েছে বলবেন তো! আপনি যদি না বলেন তাহলে আমরা বুঝব কী করে, জানব কী করে।'

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বাঁ হাতটা ছাদের দিকে উঁচু করে ধরেন কিছলু ভাই। আমরা তার হাত অনুসরণ করে ছাদের দিকে তাকাই এবং চমকে উঠি সঙ্গে সঙ্গে। কিছলু ভাইয়ের পরনের লুঙ্গিটা ফ্যানের সঙ্গে পেঁচিয়ে আছে।

'এটা কীভাবে হলো!' পল্লব অবাক হয়ে বলে।

'এটা এমনি এমনি হয় নাই।' কিছলু ভাই গম্ভীর হয়ে বলেন।

'না মানে ফ্যানের বাতাসেও তো উড়ে গিয়ে পেঁচাতে পারে।'

'না, তা পারে না।'

'তাহলে কেউ একজন করেছে।' আমি বলি।

'হ্যাঁ, এবং সেটা হয় তুমি করেছ, নাহয় পল্লব করেছে।'

'আমাদের দুজনের নাম বললেন, রবির নাম বললেন না কেন?'

'রবি তোমাদের মতো ওত ফাজিল না।'

'ও ভদ্র ছেলে?'

'ভদ্র না হলেও তোমাদের মতো ওত খাট্টাশ না।'

আমরা আর কিছু বলি না। মন খারাপ করে কিছলু ভাইয়ের রুম থেকে বের হয়ে আসি। আমাদের রুমে এসে দেখি রবি কিট কিট করে হাসছে। আমাদের স্পষ্ট মনে পড়ে যায়, গত রাতে আমি আর পল্লবের কেউই কিছলু ভাইয়ের রুমে যাই নাই, রবি গিয়েছিল। এবং আকামটা যে রবিই করেছে, সেটা এখন রবির চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। অথচ কিছলু ভাই বললেন...

টেলিফোনটা বাজতে বাজতে থেমে যায়, একটু পর আবার বেজে ওঠে।

কাজ নাই কাম নাই এত সকালে কে যে ফোন করে! ঘুম এখনো পুরেনি, আরো একটু ঘুমানো দরকার। কিন্তু টেলিফোনটা বাজছেই, একনাগাড়ে বেজেই চলেছে। কাত হয়ে পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলি, 'এই, ফোন ধরছিস না কেন?'

পল্লব আরো টানটান হয়ে শুয়ে বলে, 'তুই ধরছিস না কেন?'

'আমি তো ঘুমিয়ে আছি।'

'আমিও তো ঘুমিয়ে আছি।'

'ঘুমের ভেতর কথা বলছিস কীভাবে!'

'তুই যেভাবে বলছিস।' পল্লব বালিশটা কানের ওপর চেপে ধরে।

'রবিকে বল না।'

'তুই বল।'

'রবিকে দেখছি না তো।'

'বাথরুমে গেল নাকি। ওখানে একবার ঢুকলে তো আধঘণ্টার আগে বের হওয়ার কোনো নামগন্ধ থাকে না ওর।'

'টেলিফোনটা বেশ বিরক্ত করছে, তুই একটু যা না বাপ।' অনুরোধের ভঙ্গিতে পল্লবকে বলি আমি।

'যেতে তো আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু গিয়েই তো কিছলু ভাইকে দেখতে হবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এ রকম একটা দৃশ্য দেখলে দিনটা ভালো যাবে মনে করিস?' পল্লব কেমন যেন অসহায় হয়ে বলে, 'এক শালিক না, চামড়া ওঠা কোনো কুকুর না, দুদকের লিস্টের কোনো দুর্নীতিবাজও না, একেবারে ন্যাংটো একটা মানুষ!'

রবি হঠাৎ বাথরুম থেকে বের হয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কখন থেকে টেলিফোনটা বাজছে, ধরছিস না কেন তোরা?' আমাদের কোনো জবাবের অপেক্ষা না করেই কিছলু ভাইয়ের রুমের দিকে দৌড়ে যায় রবি। তারপর রিসিভার তুলেই একটু অপেক্ষা করে বলে, 'কে!' তারপর আমরা কিছু শুনতে পাই না এ রুম থেকে। একটু পর রবিই কিছুটা দৌড়ে এসে বলে, 'শুনেছিস, একটা মেয়ে নাকি এসেছে?'

পল্লব কানের ওপর থেকে বালিশ সরিয়ে বলে, 'কে এসেছে?'

'একটা মেয়ে এসেছে।'

'তোকে কে বলল?'

'ওই যে কিছলু ভাই যেখান থেকে টেলিফোন লাইন নিয়েছেন, সেখানকার একটা লোক বলল।'

'ফোনটা তাহলে ওখান থেকে এসেছিল?' পল্লব বিছানায় উঠে বসে বালিশটা কোলের ওপর নেয়।

'হ্যাঁ।'

'কার কাছে এসেছে মেয়েটা?'

'সেটা নাকি বলেনি।'

'কেন এসেছে?'

'তাও নাকি বলেনি।'

'কিছলু ভাইয়ের কোনো ক্লায়েন্ট না তো?'

'কোনো মেয়ে-ক্লায়েন্ট সাধারণত এত সকালে আসবে না, এলেও একা আসবে না।' রবি বিছানার পাশে বসে।

'মেয়েটা একা এসেছে নাকি?'

'তা-ই তো বলল।'

'কোথায় আছে এখন মেয়েটা?'

'নিচে ওই টেলিফোনের দোকানেই আছে। আমি বলেছি আমরা ফোন করে বলার পর যেন পাঠায়।'

কিছলু ভাই লুঙ্গিতে গিঁট দিতে দিতে এ রুমে ঢুকে ঘুম ঘুম গলায় বলেন, 'কে এসেছে?'

'একটা মেয়ে এসেছে।'

'কোথায়?'

'নিচে বসে আছে।'

'নিচে বসে আছে কেন, ওপরে আসতে বলো।' কিছলু ভাই লুঙ্গিটা খুলে আবার গিঁট বাঁধতে থাকেন।

রবি একটু সোজা হয়ে কিছলু ভাইয়ের দিকে ঘুরে বসে বলে, 'একটা মেয়ে এসেছে, তাকে এই সাতসকালে অগোছালো ঘরে নিয়ে আসি কীভাবে?'

'তাই তো!' কিছলু ভাই দৌড়ে তার রুমে যেতে নিতেই আমাদের খাটের পাশে মেঝেতে রাখা পানিভর্তি জগটা উল্টে ফেলে দেন। কিন্তু তিনি দু পা এগিয়েই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মেঝের পানির দিকে খেয়াল না দিয়ে আমাদের উপদেশের ভঙ্গিতে বলেন, 'ঘর-টর একটু পরিষ্কার করো তোমরা। মেয়েটা এসে যদি আমাদের এভাবে দেখে, প্রেস্টিজ থাকবে?'

কথাটা শুনেই পল্লব কিছুটা দ্রুত গতিতে বিছানা থেকে নামতে যায়, কিন্তু বিছানার চাদর পায়ের সঙ্গে পেঁচিয়ে ঠাস করে পড়ে যায় সে মেঝের ওপর।

ব্যথা পেলেও ব্যথাকে পাত্তা না দিয়ে পল্লব আরো দ্রুতগতিতে উঠে দাঁড়ায়, তারপর চাদরটা কোনো রকমে ছাড়িয়ে যেই না সামনের দিকে এগোতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে কিছলু ভাই বলেন, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বাথরুমে।'

'দাঁড়াও, আমি আগে যাব।'

'না, আমার একটু অসুবিধা আছে, আমাকে আগে যেতে হবে।'

'বললাম না তুমি পরে যাও!'

বাথরুম যাওয়া নিয়ে দুজন তর্কাতর্কি শুরু করে দেয়। এই ফাঁকে আমি টুক করে বাথরুমে ঢুকে পড়ি। বেশি দেরি করিনি আমি, মাত্র তিন মিনিট পর বাথরুম থেকে বের হতেই কিছলু ভাই চিৎকার করে বলেন, 'এত দেরি করলে কেন তুমি?' আমার দিকে এক পলক রাগী চাহনি দিয়েই বাথরুমে ঢুকে পড়েন তিনি।

পল্লব মশারিটা খুলতে খুলতে বলল, 'বিছানার চাদরটা ঠিক কর তো অর্ণক।'

চাদর ঠিক করতে করতে আমি দেখি, রবি খুব যত্ন করে মেঝেতে কিছলু ভাইয়ের ফেলা পানিগুলো একটা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করছে। পরিষ্কার শেষে মেঝেটা ঝাড়ুও দিচ্ছে। বেচারার জন্য এ মুহূর্তে একটু মায়াই হলো আমার।

মিনিট পাঁচেক পর কিছলু ভাই আ আ করতে করতে বাথরুম থেকে বের হয়ে বললেন, 'মরে গেলাম রে, মরে গেলাম।'

দ্রুত আমি কিছলু ভাইকে চেপে ধরে চেয়ারে বসিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে কিছলু ভাই?'

কিছলু ভাই কথা বলেন না, খালি আ আ করেন। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে তার। আমি একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'খালি আ আ করলে হবে? বলবেন তো আপনার কী হয়েছে?'

আ আ করতে করতেই কিছলু ভাই বলেন, 'প্রথমে শেভ করতে গিয়ে দেখি শেভিং ক্রিমে ফেনা ওঠে না। তবু কষ্টেসৃষ্টে শেভ করলাম। কিছুক্ষণ পর দাঁত ব্রাশ করার জন্য ব্রাশে পেস্ট নিয়ে মুখে দিয়ে দেখি তিতা তিতা লাগে, তবু ব্রাশ করতে লাগলাম। একটু পর দেখি আর সহ্য করা যাচ্ছে না। তিতা তো লাগছেই, মুখটাও পোড়াচ্ছে।'

'কেন?'

'তাড়াহুড়া করতে গিয়ে শেভ করেছি পেস্ট দিয়ে আর দাঁত ব্রাশ করেছি

শেভিং ক্রিম দিয়ে।' কিছলু ভাই আগের মতোই আ আ করে বলেন, 'ঘরে চিনি আছে না, একটু চিনি আনো তো দেখি।'

পাশে রবি বসে ছিল, ও দ্রুত উঠে গিয়ে কিচেন থেকে পিরিচে করে চিনি নিয়ে আসে। কিছলু ভাই খপ করে ওর হাত থেকে পিরিচটা নিয়ে প্রায় সবটুকু চিনি মুখে ঢেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে থু থু করতে করতে বলেন, 'এটা কী এনেছ রবি?'

'কেন, চিনি এনেছি?'

'চিনি এটা?' বলেই রাগে পিরিচটা ঠাস করে মেঝের ওপর আছাড় মারেন। প্রচণ্ড শব্দে খানখান করে ভেঙে যায় পিরিচটা। তারপর গজগজ করতে করতে বলেন, 'আনতে বললাম চিনি, আর নিয়ে এসেছ লবণ!' আমি এবার দৌড়ে কিচেনে যাই। সেখান থেকে চিনি এনে কিছলু ভাইয়ের হাতে দিই।

আমার আবার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পরে। কিন্তু সেদিকে এগিয়ে যেতে দেখেই পল্লব বলে, 'তুই না কিছুক্ষণ আগে বাথরুম থেকে ঘুরে এলি।' আমি খুব শান্ত স্বরে বললাম, 'বন্ধু আমার, পৃথিবীতে দুজন মিলে অনেক কাজই করা যায়, যদি দুজন মিলে বাথরুমের কাজটাও করা যেত, তাহলে তোকে মানা করতাম না, তোকেও সঙ্গে নিতাম।' আমি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেই। একটু পর বেরিয়ে আসতেই পল্লব ঢোকে সেখানে।

বেশিক্ষণ সময় নেয় না পল্লবও। ও বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবি ঢোকে বাথরুমে। কিন্তু রবি বের হওয়ার পরই শুরু হয়ে যায় সাজুগুজুর প্রতিযোগিতা। আমি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে মাথা আঁচড়াই, পল্লব মুখে আফটার শেভ লোশন মাখার পর ফরসা হওয়ার একটা ক্রিম মাখছে, রবি পা থেকে মাথা পর্যন্ত ননস্টপ সেন্ট মেখেই যাচ্ছে। আ আ করতে করতে কিছলু ভাইও নিজেকে ফিটফাট করার চেষ্টা করছেন। পল্লব একটু সরে এসে কিছলু ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনাকে তো খুব সুন্দর লাগছে কিছলু ভাই, অতীব সুন্দর। আগামীবার বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন নাকি!'

কিছলু ভাই পল্লবের দিকে আগুন-চোখে তাকিয়ে বললেন, 'পল্লব, এটা ইয়ার্কি মারার সময় না। একটা ভদ্র মেয়ে আসছেন আমাদের রুমে, আমাদেরও এখন একটু ভদ্র হওয়া প্রয়োজন।'

'স্যরি কিছলু ভাই।'

টেলিফোনটা আবার বেজে ওঠে। কিছলু ভাই শার্টের কলার ঠিক করতে করতে বলেন, 'অর্ণক, যাও তো কে ফোন করল আবার।'

কিছলু ভাইয়ের ঘরে গিয়ে ফোনটা রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে বলল, 'মেয়েটাকে কি পাঠাব এখন?'

'একটু ধরুন।'

রিসিভার পাশে রেখে কিছলু ভাইয়ের সামনে এসে বলি, 'মেয়েটাকে কি পাঠাবে এখন?'

আয়নায় বেশ কয়েকবার নিজেকে উল্টেপাল্টে দেখে কিছলু ভাই বলেন, 'হ্যাঁ, এখন পাঠাতে বলো।'

মেয়েটাকে পাঠাতে বলে এ ঘরে আসার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই কলবেল বেজে ওঠে আমাদের। পল্লব একটু এগিয়ে যেতে নিয়েই হাত দিয়ে ওকে ইশারা করে থামিয়ে দেয় কিছলু ভাই, 'আমি এ রুমে সবার চেয়ে বড়, দরজা আমি খুলব।'

কলবেলটা আবার বেজে ওঠে। বেশ একটা ভাব নিয়ে কিছলু ভাই এগিয়ে যান, পেছন পেছন আমরাও।

দরজা খুলে দেন কিছলু ভাই। তারপর সামনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'আপনি এসেছেন?'

'জি।'

কিছলু ভাই আগের চেয়েও কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'আপনি আমাদের কাছে এসেছেন?'

'জি।'

ভীষণ বিরক্তি নিয়ে কিছলু ভাই এবার বলেন, 'কেন?'

'আপনাদের নাকি একটা কাজের বুয়া লাগব?'

কিছলু ভাই ব্যর্থ হওয়ার পর আমি এখন অন্য একটা লাইন ধরেছি–আধ্যাত্মিক লাইন। চিঠিতে যেহেতু কাজ হলো না, সেহেতু এটাই শেষ পথ। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে একটা পীরের খোঁজ পেয়েছি, খুবই কামেল পীর। কামানের গুলি মিস হয়, কিন্তু পীরসাহেবের তাবিজ কখনো মিস হয় না। তিনি একটিমাত্র তাবিজই দেন। সেটা দিয়ে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হার্ট ডিজিস, পাইলস, এইডস—সব রোগ তো সারেই, এ তাবিজ অনেক মনোবাসনাও পূর্ণ করে। ইদানীং এ তাবিজ গলায় ঝোলালে নাকি যাদের সন্তান হয় না তাদের সন্তানও হয়।

পীরসাহেবের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় লোপা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'অর্ণক ভাইয়া, আম্মু আপনাকে ডাকে, এখনই যেতে বলেছে আপনাকে।'

'কেন?'

'রন্টু ভাই গলায় ফাঁস নিয়েছে।'

'কী!' বলেই লোপাকে সঙ্গে নিয়ে তিনতলার দিকে দৌড়াই। আমাকে দেখেই আন্টি হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, 'অর্ণক, দেখো আমার রন্টু কী করেছে!'

'কী করেছে?'

'কাল রাত থেকে ঘর হতে বের হয় না। খাওয়ার জন্য ডাকি তাও বের হয় না। ভীষণ ভয় পেয়ে যাই আমি। শেষে উপায় না পেয়ে ওর ঘরের জানালার একটা পাট টেনে ফাঁক করে দেখি ও গলায় দড়ি দিয়ে বসে আছে। একদম চুপচাপ। কথা নেই বার্তা নেই, একনাগাড়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।' আন্টি কাঁদতে কাঁদতে বলেন।

'আর এসব কিছুর জন্য দায়ী আপনি।' পাশ থেকে রুহিনা রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে আমাকে বলে।

'আমি দায়ী!'

'আপনি না তো কে? ও তো আপনাকে গুরু মানে। আপনি যদি ওকে বলেন, রন্টু, যাও তো বাথরুমের কমোডের পানি খেয়ে আসো, ও তা-ই করবে।'

'ব্যাপারটা ঠিক তা না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, এ বয়সের ছেলেরা এ সময়টাতে অনেক কিছু নিয়ে ইনডিসিশনে ভোগে, তারা অনেক কিছু জানতে চায়, তারা সব সময় প্রত্যাশা করে কেউ একজন তাদের আগলে রাখুক, সব সমস্যার সমাধান করুক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা হতাশ হয়। রন্টুকে দেখে কেন যেন আমার প্রথমেই ভালো লেগে যায়, ওর প্রতি তাই আমার ভালোবাসাও জন্মে যায়। আর ভালোবাসার প্রশ্রয় পেলে যা হয় আর-কি। আমার কাছে এটা-ওটার সমস্যা নিয়ে আসে, আমি আমার মতো সে সমস্যার সমাধান বলে দিই এবং সেগুলো অবশ্যই ক্ষতিকর কিছু না। আপনি তো ওর বড় বোন, একবার ওকে বন্ধুর মতো ভালোবেসে দেখুন না, দেখবেন আপনাকেও গুরু হিসেবে মানছে ও।'

রন্টুর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই আমি। জানালাটা একটু ফাঁক করে ওকে ডাক দিই, 'রন্টু।'

রন্টু এক পলক জানালার দিকে তাকায়, তারপর আমাকে দেখেই গলার দড়িটা খুলে দৌড়ে এসে দরজাটা খুলে দেয়। কয়েক বছর না দেখার পর কোনো প্রিয়জনের বুকে মানুষ এত ভালোবাসা, এত আন্তরিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কি না আমার জানা নেই, রন্টু ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর মনের সমস্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, 'অর্ণক ভাইয়া, আমি অদ্ভুত কিছু কবিতার কথা ভাবতে পেরেছি। গলায় দড়ি দিয়ে ভাবলে এত সুন্দর সুন্দর চিন্তা মাথায় আসে! ন্যাংটো হয়ে কিংবা পানিতে পা চুবিয়ে বসার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে বসা অনেক ভালো।'

রন্টুর কাঁধে একটা হাত রাখি আমি। রন্টু আমার চোখ বরাবর তাকায়। কী সরল চাহনি, কী বিশ্বাস গেঁথে আছে সেখানে! চোখে পানি এসে যায় আমার। 'রন্টু, তুমি আর কখনো এসব করবে না। মা কষ্ট পায়, বাবা কষ্ট পায় এমন কাজ না করাই ভালো। ভালো কবিতা লেখার আরো ভালো কিছু বুদ্ধি আমি তোমাকে বলে দেব। আর একটা কথা, তুমি কয়েক জায়গায় কবিতা পাঠিয়েছ না, দেখবে আজ-কালের মধ্যেই তোমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে কোথাও। তখন কিন্তু বিশাল একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

আন্টির দিকে ঘুরে দাঁড়াই আমি, 'আন্টি, আশা রাখি রন্টু আর এ রকম

কিছু করবে না। ওর একটু বেশি রকম ভালোবাসা দরকার। ওটুকু পেলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ওর।'

পীরসাহেবের রুমে ঢুকেই দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। চারদিকে কেমন যেন কড়া জর্দার মতো গন্ধ। চোখ বন্ধ করে বসে আছেন তিনি, সামনে একটা মাটির পাত্র থেকে ধোঁয়া উঠছে, পেছনে পাখা হাতে একজন বাতাস করছে, দুজন দু'পাশের কাঁধ আর হাত-পা টিপছে।

চোখবন্ধ অবস্থাতেই পীরসাহেব আমাকে ইশারা করলেন। আমি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলাম। একটু পর একজন এসে সারা ঘরে গোলাপজল ছিটিয়ে দিয়ে গেল। আরেকজন এসে মাটির পাত্রটাতে কী যেন রাখল, দপ দপ করে জ্বলে উঠল সেটা সঙ্গে সঙ্গে।

প্রায় আধঘণ্টা পর পীরসাহেব চোখবন্ধ অবস্থাতেই বললেন, 'আপনার সমস্যাটা আমি বুঝতে পেরেছি, হৃদয়ঘটিত সমস্যা। কোনো অসুবিধা নেই, কাজ হয়ে যাবে। তা মেয়ের কোনো ছবি আছে আপনার কাছে? কালার দরকার নেই, সাদা-কালোতেই চলবে।'

'জি না।'

'মেয়ের কোনো চুল জোগাড় করতে পারবেন আপনি?'

'একটু সমস্যা হবে আমার জন্য।'

'মেয়ে দেখতে কেমন—অতীবসুন্দরী, না সাধারণ সুন্দরী?'

'আমার চোখে তো অনিন্দ্য সুন্দরী।'

'অনিন্দ্যসুন্দরী মানে কী?'

'অনিন্দ্যসুন্দরী মানে...।'

'দেখুন, যে বাংলা শব্দের মানে জানেন না সেটা বলবেন না। আচ্ছা, মেয়ের উচ্চতা কেমন?'

'ভালোই।'

'স্বাস্থ্য?'

'স্বাস্থ্যও ভালো।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন পীরসাহেব। তারপর একটা হাত উঁচু করে বলেন, 'আমি একটা তাবিজ দিচ্ছি আপনাকে। এর জন্য আপনাকে হাদিয়া দিতে হবে দুই শ পঁচিশ টাকা পঁচিশ পয়সা। নগদ দিতে হবে। টাকা আছে তো আপনার কাছে?'

'জি আছে। কিন্তু পঁচিশ পয়সা খুচরো নেই।'

'টাকা আছে তো, টাকা দিলেই হবে। পঁচিশ পয়সা রেখে বাকি পঁচাত্তর পয়সা ফেরত দেওয়া হবে। সঙ্গে একটা দোয়া লিখে দিচ্ছি। এর জন্য দিতে হবে এক শ এক টাকা।'

'এর সঙ্গে কোনো খুচরো পয়সা দিতে হবে না?'

'না, এখানে কোনো খুচরা পয়সার কারবার নেই।' পীরসাহেব একটু থেমে বলেন, 'এবার নিয়মাবলি বলে দিচ্ছি। প্রথমে গোসল করে পবিত্র হয়ে নেবেন। গোসলের পানিতে একটু গোলাপজল আর জাফরান মেশালে ভালো হবে। তারপর সুতির একটা গামছা দিয়ে মাথা মুছে ওজু করে নেবেন। এ অবস্থায় কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। ভাত খাওয়ার ঠিক দশ মিনিট আগে একটা পরিষ্কার কাচের গ্লাসে পানি নিয়ে সেই পানিতে তাবিজটা ভিজিয়ে রাখবেন। ভাত খাওয়া শেষ হলে আরো দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখবেন। এবার দোয়াটা পড়ে নেবেন এগারোবার, তার আগে মেয়ের নামটা মনে মনে উচ্চারণ করে নেবেন তিনবার। মেয়ের নাম জানেন তো?'

'জি।'

'পড়া শেষে গ্লাস থেকে তাবিজটা তুলে আরো এগারোবার পড়ে নেবেন দোয়াটা। তারপর চুপচাপ চোখবুজে বসে থাকবেন পুরো তিন মিনিট। ব্যস, এরপর সবটুকু পানি খেয়ে নেবেন এক ঢোকে, এক নিঃশ্বাসে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন শুরু। দেখবেন, মেয়ে আপনাকে ত্যক্ত করে ছাড়বে।'

খুব যত্ন করে তাবিজ আর দোয়াটা পকেটে ভরে বাসায় এসেই দেখি বাবা বসে আছেন আমার ঘরে। আমাকে দেখেই বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'একটু কাজ ছিল বাইরে।'

'তোমার হাতে ওগুলো কী?'

'একটা সুতির গামছা কিনে আনলাম।'

'গোলাপজলের বোতলও তো দেখছি।'

'মাঝে মাঝে দরকার পড়ে তো তাই নিয়ে আসলাম।'

'আমি জরুরি একটা কাজে এখানে এসেছিলাম। এখানে তো সব সময় আসা হয় না, তাই ভাবলাম তোমাকে একটু দেখে যাই। তা ছাড়া তোমার মা তোমার জন্য কিছু জিনিসও পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার সঙ্গে।' বাবা ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করতে লাগলেন।

'হাতমুখ ধুয়েছেন?'

'না, মাত্রই এলাম। এসেই দেখি দরজা-জানালা সব বন্ধ। ভাগ্যিস একটু পরই তোমার ওই বন্ধুটা এসে উপস্থিত।'

'কে?'

'ওই যে রবি না কী যেন নাম?'

'ও কোথায়?'

'সম্ভবত বাথরুমে।'

'জামা-কাপড় চেঞ্জ করে হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খাবার দিচ্ছি, তারপর রেস্ট নেবেন।'

'এখন আর রেস্ট নিতে পারব না। বিকেল চারটার ট্রেনেই চলে যেতে হবে, কাল আবার কয়েকটা জরুরি কাজ সারতে হবে।'

বাবাকে খাবার দিলাম আমি। বাবা বললেন, 'তুমি খাবে না?'

'আমি একটু পরে খাচ্ছি।'

'তোমার ওই বন্ধু?'

'ও বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে।'

বাবা খাওয়া শেষ করে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। চারটা বাজতে বেশ দেরি আছে। আমার আর একমুহূর্তও সহ্য হচ্ছে না। দ্রুত গোলাপজল মিশিয়ে গোসল সেরে, সুতির গামছায় গা মুছে, ওজু করে, এক গ্লাস পানি আর ভাতের থালাটা নিয়ে কিছলু ভাইয়ের রুমে চলে এলাম। কিছলু ভাই অফিসে, রুম ফাঁকা, সবকিছু পীরসাহেবের নির্দেশমতোই করার প্রস্তুতি নিলাম।

গ্লাসে তাবিজ চুবিয়ে, ভাত খেয়ে, দোয়া পড়ে, চোখ বুজে বসে আছি আমি। তিন মিনিট বসে থাকার কথা, দুই মিনিট প্রায় হয়ে গেছে, আর মাত্র এক মিনিট। ব্যস, রহিনা তাসকিন, তুমি এবার যাবে কোথায়!

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হয়। চোখ দুটো খুলে ফেলি আমি। দেখি, স্বয়ং বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি পরম তৃপ্তি নিয়ে আমার তাবিজ ভেজানো পানি ঢক ঢক করে গিলে ফেলছেন। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি বাবার দিকে। হায় হায়! এটা কী হলো!

সন্ধ্যার একটু আগে বাসায় ঢুকেই পল্লব মন খারাপ করে বলল, 'ভয়ঙ্কর একটা খারাপ খবর আছে রে।'

রবি চা বানাচ্ছিল। চা বানানো শেষ না করেই পল্লবের দিকে ছুটে এসে বলল, 'কিসের খারাপ খবর?'

'কিছলু ভাইয়ের চাকরি চলে গেছে।'

'কী!' রবি কিছুটা শব্দ করে বলল, 'তুই জানলি কী করে?'

'কিছলু ভাইয়ের কলিগ, ওই যে মিজান ভাই, রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন।'

মন খারাপ করে শুয়ে ছিলাম, আস্তে আস্তে উঠে বসি, 'চাকরিটা কবে চলে গেছে, জানিস?'

'সেটা অবশ্য জানতে পারিনি। মিজান ভাইয়ের কী একটা তাড়া ছিল, এটুকু বলেই দ্রুত চলে গেলেন।'

'আমি বোধহয় জানি।'

পল্লব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়, 'তুই জানিস!'

'হ্যাঁ। কিছলু ভাই যেদিন টেলিফোন সেটটা বাসায় নিয়ে এলেন, সেদিন ভোররাতের দিকে ঘুম ভেঙে যায় আমার। বাথরুমের দিকে যেতে নিয়েই দেখি বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। চুপচাপ, কেন যেন মনে হলো একা একা তিনি কাঁদছেন।'

'আমাদের বলিসনি তো?'

'ব্যাপারটা আসলে ভুলে গিয়েছিলাম।'

রবি ছলোছলো চোখে বলে, 'মানুষটার সঙ্গে সারা দিন কত ইয়ার্কি-ফাজলামো করি, অথচ একটু টের পাইনি লোকটার চাকরি চলে গেছে।'

'এমনকি আমাদের বুঝতেও দেননি।' পল্লবের গলার স্বরটা কেমন করুণ

শোনায়।

ছাদের গেটে শব্দ হয়। আমরা কান পেতে থাকি। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কিছলু ভাই ঢোকেন রুমে। তার হাতে ছোটখাটো একটা ছাগলের সমান ব্রয়লার মুরগি। সেটা একটু তুলে ধরে হাসি হাসি মুখ করে তিনি কী একটা বলতে নিয়েই থেমে যান। তারপর আমাদের দিকে কপাল ভাঁজ করে তাকিয়ে বলেন, 'কেউ মারা গেছে নাকি কারো?'

আমরা কেউ কিছু বলি না।

'আহ্, কথা বলছ না কেন তোমরা, বললাম না কেউ মারা গেছে নাকি কারো?'

রবি কিছুটা অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'না।'

কিছলু ভাই রবির দিকে ঘুরে দাঁড়ান, 'তাহলে সবাই এমন চেহারা করে রেখেছ কেন তোমরা?'

'না, এমনি। সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম তো, কেমন মন খারাপ মন খারাপ লাগছে।' কিছলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করি আমি, 'তা কিছলু ভাই, এত বড় মুরগি আনলেন যে হঠাৎ?'

'হঠাৎ না, অনেক দিন ধরেই আনতে ইচ্ছে করছিল। সময়-সুযোগ হয়ে ওঠেনি, তাই আনা হয়নি। আজ আমরা সবাই মিলে এটা রাঁধব এবং সারা রাত ভরে খাব। বাসায় পোলাওয়ের চাল আছে নাকি?'

রবি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলে, 'না থাকলে কী, আমি এখনই নিচে গিয়ে নিয়ে আসি।'

রবি বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই কিছলু ভাই বলেন, 'রবি, আজ সব খরচ আমার। খবরদার, তোমরা একটা ফুটো পয়সাও খরচ করার চেষ্টা করবে না, প্লিজ।'

'মুরগিটা জবাই করে আনলেন না কেন কিছলু ভাই?' পল্লব গিয়ে কিছলু ভাইয়ের হাত থেকে নিজের হাত নেয় মুরগিটা।

'একটা জিনিস খেয়াল করেছ তোমরা, ছোটবেলা আমাদের বাবা-চাচারা বাড়িতে মুরগি নিয়ে আসতেন। আমরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কোনো হুজুর কিংবা মৌলবি সাহেব সেটা জবাই করে দিতেন। আমরা আনন্দে লাফালাফি করতাম। সেই আনন্দটা এখন আর নেই। এখন যেখান থেকে মুরগি কেনো, সেখান থেকেই জবাই করো। আমরা আজ আনন্দ নিয়ে মুরগি জবাই করব, ছিলব এবং রাঁধব।'

'জবাই করবে কে?'

'কে আবার? আমাদের চারজনের মধ্যে তো মুরগি জবাই করার একজনই আছে। আমরা তো কেউই নামাজ-কালাম পড়ি না, রবিই যা হয় একটু পড়ে, মুরগিটা ও-ই জবাই করবে।'

আমরা সবাই রবির দিকে তাকাই এবং যারপরনাই চমকে উঠি। রবি কাঁদছে। কিছলু ভাই রবির দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'কী হয়েছে রবি?'

রবি সঙ্গে সঙ্গে কিছলু ভাইকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠে বলে, 'আপনার চাকরি চলে গেছে কিছলু ভাই।'

ঝট করে আমি কিছলু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাই। হাসি হাসি মুখটা কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে যায় কিছলু ভাইয়ের। কিছুক্ষণ, তারপরই হো হো করে হেসে ওঠেন তিনি, 'চাকরি চলে গেছে তাতে কী হয়েছে, আরেকটা চাকরি হবে, না হলে ব্যবসা করব। দেখছ না, এরই মধ্যে একটা টেলিফোন আনলাম, ফার্ম খুলে বসলাম!'

'আমার যখন দশ বছর, তখন আমার বাবার একবার চাকরি চলে গিয়েছিল। সে বছর ঈদে আমরা একদম আনন্দ করতে পারিনি, আম্মাও কিছু রান্না করেনি।'

রবিকে জড়িয়ে ধরেন কিছলু ভাই, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেন। আশ্চর্য, তিনিও এখন কাঁদছেন।

ছাদে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেতেই ঝটপট চোখ মুছে নেন রবি আর কিছলু ভাই। এরই মধ্যে রন্টু এসে ঢুকে পড়েছে ঘরে। আমার একটা হাত জাপটে ধরে বলে, 'অর্ণক ভাইয়া, আম্মু এসেছে।'

'কোথায়?'

'ওই তো বাইরে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে।'

দ্রুত ছাদে গিয়েই দেখি আন্টি আর লোপা দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে বলেন, 'একটা সুখবর আছে।'

বুকের ভেতর ছ্যাত করে ওঠে আমার—রুহিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল নাকি! কিছুটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলি, 'কী সুখবর আন্টি?'

আন্টি রন্টুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুই বল!'

রন্টু কিছু বলে না, কেমন যেন লজ্জা পায়। কেবল একটা পেপার আমার দিকে এগিয়ে দেয়। আমি সেটা খুলে দেখি ছোটদের একটা পাতায় রন্টুর একটা

কবিতা ছাপা হয়েছে।

আন্টি হাসতে হাসতে বলেন, 'ওর কবিতা ছাপা হয়েছে, ও আজ তোমাদের সবাইকে খাওয়াবে। সেই দাওয়াত দিতেই এসেছে তোমাদের।'

'সেটার কি কোনো দরকার ছিল রন্টু?'

'ছিল।'

'ছেলের কবিতা ছাপা হয়েছে, ছেলের সঙ্গে সঙ্গে বাপও নাচতে শুরু করেছে।' আন্টি হাসতে হাসতে বলেন।

'আঙ্কেল এখন কোথায়, আন্টি?'

'তোমরা খাবে, বাজার করতে গেছে।' আন্টি যেতে যেতে বলেন, 'তোমরা দেরি কোরো না কিন্তু, তাড়াতাড়িই চলে এসো।'

খাওয়া শেষ করে সবাই চলে আসে রন্টুদের বাসা থেকে, আমি একটু পরে আসি। এসেই শুনি বাড়িওয়ালা আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেছেন। কারণ দুটো। এক. আমাদেরকে এ বাসাটা ভাড়া দিয়েছেন তিনি থাকতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়। কিছলু ভাই এ বাসাতে ব্যবসা শুরু করেছেন, এটা তিনি মানতে পারছেন না। দুই. বাড়িওয়ালার তিন মেয়ের কোন মেয়ের সঙ্গে নাকি আমাদের কেউ গল্প করেছে অনেকক্ষণ, এটা আবার পাশের বাসার কে যেন দেখেছেন এবং বলে দিয়েছেন বাড়িওয়ালাকে।

কিছলু ভাই আমাকে দেখে খুব নরম গলায় বলেন, 'কোনো কিছুই আর ভাল্লাগছে না অর্ণক।'

চোখ ফেটে জল এসে যায় আমার। কিছলু ভাইকে এ মুহূর্তে কেমন যেন অসহায় লাগে। পল্লবের দিকে তাকাই আমি, মাথা নিচু করে ফেলেছে ও, রবি তাকিয়ে আছে অন্য দিকে।

'কোনো চিন্তা করবেন না কিছলু ভাই, একদম না। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'যা একবার নষ্ট হয়, তার কোনো কিছুই ঠিক হয় না রে ভাই।'

'কে বলল হয় না, অবশ্যই হয়।'

'সান্ত্বনা দিচ্ছ আমাকে?'

'হ্যাঁ, নিজেও শান্ত হচ্ছি।'

ছাদে বেশ শব্দ করে দৌড়ে এসে কে যেন বলে, 'অর্ণক আছেন?'

দ্রুত আমি ছাদে গিয়ে দাঁড়াই। দেখি, শিমু দাঁড়িয়ে আছে, কাঁপছে ও। আমি ওর আরো একটু কাছে গিয়ে বলি, 'কী হয়েছে শিমু?'

'বাবা কেমন যেন করছে। আমাদের বাসায় তো কোনো ছেলেমানুষ নেই, আপনি একটু আসবেন?'

রবি, পল্লব, কিছলু ভাই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে আমরা চারজনই নেমে যাই দোতলার দিকে।

সারা রাত আমরা হাসপাতালের বেঞ্চে বসে আছি। শিমুর বাবাকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। স্ট্রোক করেছেন তিনি, তবে সামান্য, আপাতত বিপদমুক্ত।

সামনের বেঞ্চটাতে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে শিমু। আমাদের মতো সেও ঘুমায়নি সারা রাত। একজন নার্স এসে বললেন, 'পেশেন্টের সবাই এখন রুমে আসতে পারেন, পেশেন্ট সুস্থ আছেন এখন।'

শিমুকে ডেকে তুলি আমি। ঘুমজড়ানো চোখে বাবার রুমে ঢুকে পড়ে ও। একটু পর বাইরে এসে আমাদেরও ডেকে নিয়ে যায় রুমে।

বাড়িওয়ালা আঙ্কেল আমাদের দেখেই একটু হাসার চেষ্টা করেন। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করে পাশে বসতে বলেন। আমরা তার পাশে বসি, চুপচাপ বসে থাকি অনেকক্ষণ। দরজার কাছে শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি, শিমুর দু বোন আর মা এসেছেন। পেছন পেছন খায়রুল আঙ্কেল, আন্টি, রুহিনা এসেছে। রন্টু আর লোপা আসেনি, সম্ভবত স্কুল আছে ওদের, স্কুলে গেছে ওরা।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বাড়িওয়ালা আঙ্কেল। এতগুলো পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তার। সবাইকে দেখে আবার একটু হাসার চেষ্টা করেন। একটু পর আমার একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'বাবারা, আমার একটা সমস্যা আছে।'

'জানি আঙ্কেল।'

'জানো তোমরা?'

'হ্যাঁ জানি, এবং এও জানি, আপনার সমস্যাটা খুবই সিলি একটা সমস্যা।' বাড়িওয়ালা আঙ্কেলের হাতটা আমি আমার আরেকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বলি, 'মেয়ে বড় হলে সব বাবাই চিন্তা করেন, তারা ভাবেন তাদের মেয়েদের বুঝি কেউ প্রলোভিত করল, মেয়েরাও বুঝি সে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিল।'

'ঠিক, একদম ঠিক।'

'সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা প্রলোভন, প্রলোভনের ফাঁদ। মৃত্যু এত অবশ্যম্ভাবী জেনেও আমরা সারা জীবন সে প্রলোভনের পেছনে ছুটি।'

'ঠিক, একদম ঠিক।'

'আঙ্কেল আরেকটা কথা, কোনো মেয়ে বড় হলে তার সঙ্গে অনেকে কথা বলতে চাইবেই, যেমনটা করেছেন আপনার দাদা কিংবা আমার দাদা, আপনার বাবা কিংবা আমার বাবা, আপনি অথবা আমি। এতে তো দোষের কিছু নেই আঙ্কেল!'

বাড়িওয়ালা আঙ্কেল হেসে ফেলেন। আমরা উঠে দাঁড়াই। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে আমার। হাসপাতালের বারান্দায় এসে আবার বসে পড়ি। কিছলু ভাই টয়লেটে গেছেন, রবি আর পল্লব গেছে চা আনতে।

ঘুম এসে গিয়েছিল প্রায় সবার চোখে। হঠাৎ কে যেন সামনে এসে বলে, 'ঘুমাচ্ছেন?'

চোখ মেলে দেখি রুহিনা। আমার আরো একটু সামনে এসে বলে, 'আপনাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমাইনি তো।'

'আপনারা নাকি বাসা ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'ছেড়ে দিচ্ছি না, দিতে হচ্ছে।'

'কেন?'

হাসতে হাসতে বলি, 'তা তো বলা যাবে না!'

'একটা কথা বলব আপনাকে?'

'বলুন।'

রুহিনা কিছু বলে না। আমি অপেক্ষা করে থাকি, ও কিছুই বলে না। কেবল মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ মাথাটা উঁচু করে বলে, 'আপনার বাবা কোথায়?'

ঝট করে আমি লাফ দিয়ে উঠে বলি, 'কেন?'

রুহিনা এবারও কিছু বলে না, হাসে। হায় হায়, রুহিনা বাবাকে খোঁজে কেন? তাবিজ ভেজানো পানির অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল নাকি!

বাসায় এসেই ঘুমিয়ে পড়ি। বিকেলে ঘুম ভাঙার পর টিভিটা ছাড়তেই দেখি

খবর হচ্ছে। খবরে দেখাচ্ছে সায়দাবাদের এক পীর বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সঙ্গে বত্রিশটি বিদেশি মদের বোতল, বাইশটি পর্নো সিনেমার সিডি আর ছয়জন যুবতীকে আটক করা হয়েছে তার বাসা থেকে। পীর বাবার চেহারা দেখাচ্ছে। হায় হায়, অবিকল আমাকে তাবিজ দেওয়া সেই পীর বাবা। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, আরে, সে-ই তো! ভণ্ড বাবা, ভণ্ড তাবিজ। বুকের ওপর থেকে একটা পাথর নেমে যায় আমার। রুহিনা আর বাবা—ধ্যাত, কী যে অসভ্য না আমি!

বাসাটা ছাড়তে হয়নি আমাদের। বাড়িওয়ালা আঙ্কেল হাসপাতাল থেকে এসে বলে দিয়েছেন, বাড়ি ছাড়ার দরকার নেই। কিন্তু আমি ছাড়তে চাইছি।

বাসার সামনে এখন আর আমার পায়চারি করা হয় না, করতে ভালো লাগে না। দোতলা আর তিনতলার দুটো জানালাই এখন প্রায় সব সময় খোলা থাকে। দুটো মানুষ সব সময় তাকিয়ে থাকে সেখানে থেকে, কিন্তু আমার তাকানো হয় না।

কোনো কোনো দিন সে দুজনের একজন ছাদে আসে, গল্প করে আমার সঙ্গে। যদি সে শিমু হয়, কথা বলতে বলতে আমি তাকে রুহিনা বলে ডেকে ফেলি। পরের দিন যদি আরেকজন আসে এবং সে যদি রুহিনা হয়, কথা বলতে বলতে আমি তাকে শিমু বলে ডেকে ফেলি। একটা প্রকট সংকটে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমি ক্রমান্বয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছি, সম্ভবত আমি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি, পুরোপুরি অসুস্থ।

মাঝে মাঝে কিছলু ভাই আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'অর্ণক, তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

আমি হেসে হেসে বলি, 'আমি জানি না কিছলু ভাই।'

'তুমি জানো, কিন্তু বলছ না।'

আগের মতোই আমি হেসে হেসে বলি, 'সত্যি জানি না।'

রাত হলেই আমি আরো বেশি অস্থির হয়ে যাই। বাসা ছেড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। কোনো কোনো পূর্ণিমা রাতে আমার ছায়াকে ভীষণ লম্বা দেখায়। আমি সেই লম্বা ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। আমি যতই ছায়াটা মাপতে যাই, আমার সমস্ত সুখের মতো ছায়াটাও ধীরে ধীরে সরে যায়।

হঠাৎ হঠাৎ চারপাশ থেকে কে যেন বলে, 'কী অর্ণক, আছ কেমন

'আছি..., আছি কোনোরকম।' আমার আর কিছু বলা হয় না, বলতে ইচ্ছে করে না। শুকনো খড়কুটোর মতো কেবল ভেসে যেতে ইচ্ছে করে দূরে অজানা এক দূরে!